—গল্পে বিবেকানন্দ—

"গল্পে বারভূঁইয়া", "গল্পে ভাগবত", "গল্পে রবীন্দ্রনাথ", "গল্পে শ্রীগুরু", "ফরাসীর শ্রেষ্ঠ গল্প", "ইটালীর শ্রেষ্ঠ গল্প", "দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন", "কন্দাপুরের হীরালাল", "Our Lord Brabourne"

প্রভৃতি বহু জীবনী এবং গল্প-গ্রন্থ প্রণেতা

ও নানা সাময়িক পত্রের সম্পাদক—

—শ্রীসতীশ চন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা শাস্ত্রী—

এফ্‌, এল্‌, এস্‌, বি, এ

প্রণীত

—বরেন্দ্র লাইব্রেরী—

২০৪, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌, কলকাতা

প্রকাশক—শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শুভ বৈশাখ, ১৩৪৮ সাল
মূল্য এক টাকা

প্রিণ্টার—বি, এন্ ঘোষ, আইডিয়াল প্রেস
১২।১।৩, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

—ভূমিকা—
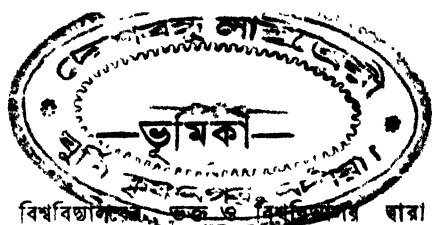
ইদানীং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভক্ত ও বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা উপকৃত নর-নারীতে সারা বাংলা ভরে উঠেছে। জ্ঞানী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অল্পাধিক সংশ্লিষ্ট ও পরিচিত, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য-পুস্তক ও নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত স্কুল, কলেজে নির্দ্দিষ্ট কাল অধ্যয়ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অধিকাংশেরই জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ, কলকাতায় যাঁ'রা থাকেন ও পড়েন তাঁদেরও অনেকে সিনেট্, আশুতোষ হল্, দ্বারভাঙ্গা বিলডিংস্, হার্ডিং হোষ্টেলের বিরাট সৌধের বহির্দ্দেশ দর্শন করেই সন্তুষ্ট, ততোধিক জ্ঞান সঞ্চয় করার তেমন প্রয়োজনও বোধ করেন না, কিন্তু এ অজ্ঞতা কি ভাল ? যাঁকে ভালবাসি তাঁকে ভাল করে জানার কি দরকার নেই ? মফস্বলের ছেলেদের, মেয়েদের তো কথাই নেই—সুযোগ ও সুবিধার অভাবে কলকাতার ছেলেদের, মেয়েদেরও, অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় কোন কিছুই তেমন জানেন না অথচ তাঁ'রা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই তাঁ'দের বড় কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপই তাঁ'দের গুণগরিমার প্রমাণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিমাই তাঁ'দের মহিমা। এই সব চিন্তা করে, এই অভাবের কথঞ্চিৎ নিরসনের নিমিত্ত এই সংক্ষিপ্ত চেষ্টা করলাম। বাংলা ভাষায় ইহাই বোধ হয় এ সম্পর্কে প্রথম চেষ্টা। এতদ্দ্বারা কা'রও বিন্দুমাত্র উপকার হ'লেও শ্রম সার্থক বোধ করব। দেহ নিতান্ত অপটু, যদি দিন পাই সংশোধনে অবহিত হইব।

৯ গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট্
কলকাতা
শুভ জন্মাষ্টমী—১৩৪৭

বিনীত
গ্রন্থকার
শ্রীসতীশ চন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা শাস্ত্রী

-উপহার—

বিশ্ববিদ্যালয়কে যাঁ'রা ভালবাসেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কথায় যাঁ'দের আনন্দ হয়, উন্নতিকামী তাঁ'দেরই কর-কমল-করে তুলে দিলেম এই গল্পে বিশ্ববিদ্যালয়।

৯ গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট
কলকাতা
এপ্রিল—১৯৪১

বহু আশান্বিত—
—গ্রন্থকার—
শ্রীসতীশ চন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা শাস্ত্রী

—উৎসর্গ—

বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব লাভ করলে—একদিন যাঁ'দের মুখ আনন্দ পরিমলে ভরে উঠেছিল, ক্ষুদ্র কুট্‌মলকে সুরভি কুসুমে পরিণত হ'তে দেখে যাঁ'দের হৃদয়ে একদিন আনন্দ-প্লাবন বয়েছিল সেই আমার—

আরাধ্যতম জনক—৺ঈশানচন্দ্র

আরাধ্যতমা জননী—৺বরদাসুন্দরী

ও

প্রিয়তমা জায়া—৺ অনুপমা মাখনবালা গুহদেববর্ম্মা—

জায়ার সাধনোচিত ধামগত আত্মার প্রীতি-স্মৃতি উদ্দেশ্যে ও স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে দৃঢ় ধারণায়—এই গ্রন্থে বিশ্ববিদ্যালয় উৎসৃষ্ট হ'ল—

পাটন—টাঙ্গাইল
জন্মাষ্টমী—১৩৪৭

তোমাদেরই—
সতীশ

সূচি-পত্র

২

ইষ্ট্-ইণ্ডিয়া কম্প্যানী তখন বাংলার শাসনকর্ত্তা। কে জানে তাঁদের বুদ্ধির দোষে, কি তাঁদের শাসনের দোষে বাংলা দেশ জুড়ে মহা অশান্তির সৃষ্টি হ'ল—সাধারণ লোক তো দূরের কথা কম্প্যানীর—গভর্ণমেণ্টের সিপাইরা পর্য্যন্ত ক্ষেপে উঠ্‌ল। তারা বিদ্রোহ সুরু করে দিলে। জায়গায় জায়গায় বেধে উঠ্‌ল খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ। দারুণ অশান্তিতে দেশ ঝালাপালা হয়ে গেল। কারও মনে, কারও প্রাণে রইল না এক তিল —এতটুকুনও শান্তি, স্বস্তি ও সান্ত্বনা। হাহাকারে দেশ ভরে গেল। সব দিকে বীভৎস দৃশ্য, ছিন্ন মুণ্ড, ভিন্ন হস্ত, ক্ষুণ্ণ কবন্ধ, রক্ত গঙ্গা, সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন আর সর্ব্বনাশ !

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ইষ্ট্-ইণ্ডিয়া কম্প্যানীর শান্তির চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে গেল। তাঁরা সামলাতে পারলেন না। কষ্টে সংগৃহীত রাজ্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন, তাঁদের দেশের তখনকার রাণী ভিক্টোরিয়াকে।

মহামনস্বিনী—মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর কর্ম্মচারীদের মধ্যে হ'তে বেছে, বেছে, সব চেয়ে উপযুক্ত লোক ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সাহেবকে পাঠালেন বাংলাদেশে—তাঁর নতুন রাজ্যে, শান্তি সংস্থাপনের জন্য। সুশাসন, সুব্যবস্থা, সুপ্রণালী অবলম্বন করে, সুকৌশলে সকলকে প্রবোধ ও সান্ত্বনা দিয়ে হেষ্টিংস্ সাহেব দেশে আবার শান্তি ও শৃঙ্খলা সংস্থাপন করলেন। শান্তির মলয় হিল্লোলে দেশ শান্ত, স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, সুস্থ ও শীতল হ'ল।

৩

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এই অতুলনীয় শাসন কালের প্রারম্ভে সব বিষয়েই উন্নতি আরম্ভ হ'ল। সংস্কৃত, বাংলা, আরবী ও পারসী ছিল তখন বাংলা দেশের প্রচলিত ভাষা, কিন্তু রাণী হ'লেন ইংল্যাণ্ডের লোক, ইংরেজ। রাণীর ভাষা ইংরেজী না শিখলে সরকারী কাযকর্ম্ম করা দুরূহ হয়ে উঠ্‌ল। তখনকার দিনে খুব অল্প লোকই ইংরেজী জানতেন। সরকারী কাযকর্ম্মে অসংখ্য কর্ম্মচারীর দরকার হ'ল। দেশীয় লোককে ইংরেজী না শিখিয়ে নিতে পারলে নানা বিষয়ে, নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হ'তে লাগল। সরকারী ও বে-সরকারী কার্য্যালয়ের এই অসুবিধা দূর করবার জন্য যে সব লোক নিযুক্ত হচ্ছিলেন তাঁরা যৎসামান্য ইংরেজী জেনেই উচ্চ বেতন পেতেন। এই সব অসুবিধা ও অভাব দূর করবার জন্যই তখনকার গভর্ণমেণ্ট্‌ ও দেশীয় নেতারা একযোগে বুদ্ধি করে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সৃষ্টি করলেন।

বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ করে তাঁদের যোগ্যতানুসারে প্রশংসা-পত্র প্রদান করাই তখনকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের লক্ষ্য ছিল। নতুন নতুন বিষয়ের শিক্ষাদান ও বিবিধ বিষয়ের গবেষণায় সাহায্য ও উৎসাহ দানাদি প্রথমেই কর্ত্তব্য বলে অবধারণ করা হয় নি।

ক্রমে ক্রমে ষাট বছর এমনই এক ঘেয়ে ভাবে চলে গেল।

৪

বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুনরূপ দিয়েছেন স্যার্ আশুতোষ। সে কথা পরে বলছি। তাঁরই চেষ্টায় সেকালের বিদেশী একালে স্বদেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারী। আর এর যত সব আইন, তখন দরকার ছিল তা'ও সেই সময়েই বিধিবদ্ধ হয়। সে আইনের নাম হয় এক্ট্ নাম্বার্ টু অফ্ এইটীন্ ফিফ্টীসেভেন্। কলকাতার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের আর দু'টী বড় বড় সহর—বোম্বাই ও মাদ্রাজেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হ'ল; কিন্তু কলকাতার এই বিশ্ববিদ্যালয়ই হয়ে দাঁড়াল সব চেয়ে বৃহৎ ও সর্ব্ববিষয়ে অগ্রগণ্য। ৭টী সরকারী ও ৬টী বে-সরকারী কলেজ এবং ৭১টী স্কুল নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠ্ল। ভাইস্ চ্যান্সেলার হলেন—মাননীয় স্যার্ জেমস্ উইলিয়াম্ কোল্‌ভিল্।

প্রথমতঃ এর পরিধি সারা উত্তর ও মধ্য ভারত এবং ব্রহ্মদেশ ব্যাপী ছিল। আগ্রা, আজমীর, এলাহাবাদ, বেরিলী, বেণারস্, ব্রহ্মদেশ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, নেপাল ও রাজপুতনার সমগ্র স্কুল ও কলেজ এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হ'ল। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর শিক্ষার ও কৃষ্টির প্রভাব এই সব জায়গায় প্রসারিত হ'তে লাগল।

এখন আর ঠিক তেমনটী নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

স্থানে এখন হয়েছে আলিগড়. এলাহাবাদ [১৮৮৭] আগ্রা, বেণারস, পাঞ্জাব [১৮৮২] লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, রেঙ্গুন [১৯২২] পাটনা [১৯১৭] ও ঢাকা [১৯২০] এ গুলি ছাড়া দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় যে ১৮৫৭ সালে স্থাপিত হয়েছিল, তা'ত আগেই বলেছি। বর্ত্তমানে মহীশূর, অন্ধ্র ও ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের এই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধাররূপে অর্থাৎ চ্যান্সেলার ও ভাইস্ চ্যান্সেলাররূপে বহু বাঙ্গালী রয়েছেন, এ কথা শুনলে হয় তো তোমরা খুব আহ্লাদিতই হ'বে।

লাহোর ইউনিভারসিটীতে স্যার্ প্রতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালী, এলাহাবাদে স্যার্ প্রমোদা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালী, লক্ষ্ণৌয়ে জ্ঞানেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী বাঙ্গালী, নাগপুরে স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসু বাঙ্গালী, মহীশূরে স্যার্ ৺ব্রজেন্দ্র নাথ শীল ছিলেন বাঙ্গালী, আগ্রায় পি, সি, বসু বাঙ্গালী।

শুনে সুখী হ'বে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভকালে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হ'লেও পরে প্রথমেই বাঙ্গালী ভাইস্ চ্যান্সেলার্ হয়েছিলেন স্যার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। অনন্তর অবস্থান্তর ও ব্যবস্থান্তর হ'লেও স্যার্ আশুতোষ একাদিক্রমে আট বছর ও তারপর আরও দু'বছর ভাইস্ চ্যান্সেলার্ ছিলেন। সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ রয়েছে

৭০টী আর স্কুল আছে ১৯৩৫টি। এ সব ভাবলে কার না আনন্দ হয়?

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে এই বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয়েছিল। এর বাহ্যাকৃতি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইলেও আভ্যন্তরীণ উন্নতি এত দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে যে ভাবলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এখনও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, শুনে হাস্‌বে নিশ্চয়, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়। এর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের পরীক্ষায় যত অধিক সংখ্যক ছাত্র ও ছাত্রী পরীক্ষা দেন ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, পৃথিবীর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও তা' হয় না। এ কি বাঙ্গালীর পক্ষে কম আনন্দের কথা!

—প্রথম অধ্যায়—

*   *   *   *

"কে রয়েছে ঘুমাইয়া অজ্ঞতার নিবিড় তিমিরে,
আলোকের যাত্রা-পথে দৈন্যাহত কা'রা আসে ফিরে ?
আজিও ফিরিছ তাই পথে পথে করিয়া সন্ধান,
অন্ধ জনে করিতেছ দ্বারে দ্বারে জ্ঞানালোক দান ?"

—গোলাম মোস্তাফা—

—প্রাচীন ও নবীন শিক্ষা পদ্ধতি—

প্রাচীন কালের কথাটাই আগে শুনে নাও, পরে বলছি নবীন কালের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কথা ভাল করে বুঝতে হ'লে এ কথাটাও নিশ্চয় মনে আসে যে আগে কি আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না ?—এমনই কি ছিল সে সব বিশ্ববিদ্যালয় ?

আগেও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, কিন্তু ঠিক এমন ছিল না ; স্কুল কলেজও ছিল কিন্তু ঠিক্ এমনতর ছিল না। কেমন ছিল একটু শোন :—

৮

বহু দিন থেকেই লেখাপড়ার চর্চ্চা চলে আসছে আমাদের দেশে। প্রাচীন কালের লেখাপড়া শেখার প্রণালীর সঙ্গে অবশ্য আধুনিক লেখাপড়া শেখার প্রণালীর তেমন মিল নেই। তবু খানিকটা যে না আছে তা'ও নয়। এখনকার মত তখনও পাঠশালা ছিল, সেগুলি বিভিন্ন প্রকারেরই ছিল। নানা বিষয় ও শেখানো হ'ত। তখনকার শিক্ষা-প্রণালী ছিল নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; আশ্রম বা তপোবনজাতীয় শিক্ষা-কেন্দ্রগুলি বারাণসীর ন্যায় মহা মহা নগরের বাইরে অথবা লোকালয়ের বহু দূরে সংস্থাপিত হ'ত। সে স্থান হ'ত প্রায়ই নির্জ্জন—অরণ্য। এই সব আশ্রমে বালক ও বালিকা সবাইকে শেখানো হ'ত যত সব প্রচলিত বিদ্যা। যাঁ'রা পড়া'তেন সেই শিক্ষক বা অধ্যাপকগণ এবং ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী—বালকবালিকাবৃন্দ সেখানকার পর্ণকুটীরে—কুঁড়ে ঘরে বাস করতো। জনপদবাসিগণ ও শিক্ষার্থিগণ এবং শিক্ষার্থিনীগণের মাতাপিতারা তাঁদের জন্য চাল, ডাল, নূন, তেল, ঘি, ননী, দুধ, শাকশব্জী, তরিতরকারী যা' কিছুর প্রয়োজন হ'ত পাঠিয়ে দিতেন। দেশবাসিগণ উৎসবাদিতে তাঁদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে বিদায়স্বরূপ যথোচিত দক্ষিণাদি দান করে তৃপ্ত করতেন।

যা'কে আজকাল প্রাইভেট্ স্কুল বলা হয়, তেমন স্কুলও

তখন যে না ছিল এমন নয়। মস্ত বড় পার্থক্য ছিল এক জায়গায়—অধ্যাপকগণ তাঁদের ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারিণী শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীগণের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করতেন। অনেক টোলে এখনও কতকটা সে নিয়ম চলে আসছে। আবার এই অধ্যাপক ও শিক্ষকগণও জনসাধারণের সাহায্যেই তাঁদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতেন। দেশীয় রাজগণ প্রায় সকলেই শিক্ষার জন্য দান করতেন। সেই সব দানে রক্ষা পেত যত সব স্নাতক শিক্ষাগার। এই সব দানকে বলা হ'ত ব্রহ্মদান বা ব্রহ্মোত্তর। এই সব দানের সম্পত্তির উদ্বৃত্ত ও রাজস্বাদি হ'তে শিক্ষাগারগুলির যত সব ব্যয় নির্ব্বাহ হ'য়ে যেত।

প্রাচীন গ্রন্থে এ সব বিষয়ের বহু উপাখ্যান পাওয়া যায়। এক বিহার অঞ্চলেই পাঁচ ছয়টী এমনতর শিক্ষাগার ছিল। এগুলিকে বলা হ'ত তখন মহাশালা।

শ্রমণ ও পরিব্রাজক যাঁ'রা হ'তেন তাঁ'দের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কথাও শোনা যায়। তাঁ'রা নানা দেশে ঘুরে বেড়াতেন। নানা বিষয়ের তর্ক করতেন। তর্কে হেরে গেলে যাঁ'র কাছে হারতেন, সময় সময় তাঁ'রই শিষ্য হ'য়ে যেতেন। এগুলি ছিল আধুনিক স্কুলেরই মত—তা'রপর, বলছি—বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। ভারতবর্ষে যে সব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তা'দের মধ্যে তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল সমধিক

প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বাধিক প্রাচীন। ভারতবর্ষ ও পারস্যের সীমান্তে ছিল এ বিশ্ববিদ্যালয়—এ ছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনকেন্দ্র স্বরূপ।

তা'রপর—বৌদ্ধযুগে গড়ে ওঠে, নালন্দা, বিক্রমশিলা, ওদন্তপুরী, জগদ্দল ও শ্রীধনকটক। সব দেশের শিক্ষার্থিগণ আসতেন এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে, পড়ে মানুষ হ'য়ে যাঁ'র যাঁ'র দেশে ফিরতেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী জনগণের মধ্যে আমরা দে'খতে পাই বাঙ্গালী—আচার্য্য শীলভদ্রকে, চন্দ্রগোবিন্দকে ও শান্ত রক্ষিতকে।

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়েও দেখি—বাঙ্গালী জেতারিকে, অভয়াকর গুপ্তকে, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশকে।

কাশীর তো কথাই নেই—মিথিলা, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর, কোটালীপাড়ায়ও বিদ্যা-কেন্দ্র ছিল। নবদ্বীপে সমগ্র বাংলার ছাত্রগণ অধ্যয়নার্থ গমনাগমন করতেন।

বৌদ্ধ সাহিত্য পড়লে প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির অনেক কথা জানা যায়—পরীক্ষাও কেমন করে হ'ত সে সব বোঝা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখানো হ'ত—"অষ্টাদশ বিদ্যা"। সে অষ্টাদশ বিদ্যা হচ্ছে ;—বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, স্মৃতি, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, অর্থশাস্ত্র, গজশাস্ত্র ইত্যাদি। ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন নাম হ'লেও এখনও প্রায় এই সবই শেখানো হয়।

তবে শেখাবার ও বলবার রকমফের হয়েছে, এই যা' পার্থক্য। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা না করলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা সমাপ্তিই ঘট্‌ত না।

পুতুল নাচ ও নাটক অভিনয় দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হ'ত। এখন পুতুলনাচ প্রায় নেই-ই,হয়েছে স্লাইড্‌, হয়েছে ফিল্ম্‌। সেকালে শিক্ষার্থিগণের মনোবৃত্তি বিচার করে মনোবৃত্তির পরিপোষক শিক্ষাই দান করা হ'ত।

তা' হ'লেই দেখা গেল প্রাচীন ও নবীনে বেশ একটা সামঞ্জস্য আছে। আজকাল যেমন করে শেখানো হয় সে সব ভেবে দেখলেই প্রাচীন ও নবীনের এই সামঞ্জস্য বেশ বোধগম্য হয়। ও-দেশী ছোঁয়াচ্‌ লাগলেও এ-দেশী রং একেবারে বদলে যায়নি। আশা আছে, হয়তো যা'বেও না।

দিনের যেমন প্রভাত, মধ্যাহ্নাদি কালভেদ আছে, পক্ষের যেমন প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি আছে, মানুষের যেমন শৈশব, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবনাদি দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়েরও তেমনই শৈশবকাল ছিল। পরে পরে সব আস্‌ছে, যাচ্ছে।

এমনই করে একে একে তা'র পাঁচ বছর বয়স হ'ল। অভিভাবকগণ তা'কে নতুন বেশ ভূষা দিলেন, সে সেজে উঠ্‌ল নতুন,অভিনব সাজসজ্জা নিয়ে। ১৮৬০ সালের এ কথা। এ বছর করা হ'ল

কতকগুলো পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন। স্থির হ'ল—দু'বছর পরে ১৮৬২ সালের জানুয়ারী মাস হ'তে সেই সাজসজ্জাগুলো বিশ্ববিদ্যালয়কে পরানো হ'বে—দেখা যা'বে কেমন দেখায় সে, সে সব পরলে।

এ পাঁচ বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ নিতেন পনেরটী পরীক্ষা। সে সব পরীক্ষার তাঁ'রা নাম দিয়েছিলেন—

১। এণ্ট্রান্স্।
২। এল্, এ।
৩। বি, এ।
৪। বি, এ, (অনার্স)
৫। এম্, এ।
৬। বি, এল্।
৭। বি, এল্, (অনার্স)
৮। এল্, এম্, এস্ (দু'টী পরীক্ষা এবং অনার্স)
৯। ডি, এম্।
১০। এম্, সি, ই (ঐ অনার্স).

একটু পরিবর্ত্তন করে করলেন :—

২। এফ্, এ।
৩। এল্ এল্।
৪। ডি, এল্।
৫। এল্, সি, ই।

পরীক্ষা সম্পর্কে কতকগুলো নতুন বিধান বিধিবদ্ধ হ'ল :—

এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষার বিষয়গুলি পূর্ব্বের মতই রইল।

১। ভাষা—ইংরেজী এবং নিম্নবর্ণিত ভাষার যে কোন একটী :—

১। গ্রীক্।
২। ল্যাটিন্।
৩। আরবী।
৪। পারসী।
৫। হিব্রু।
৬। সংস্কৃত।
৭। বাংলা।
৮। উড়িয়া।
৯। হিন্দী।
১০। উর্দ্দূ।
১১। বার্ম্মীজ্।
১২। আর্ম্মেনিয়ান্ (পূর্ব্বে ছিল না)

১৩। ইতিহাস ও ভূগোল।

১৪। গণিত।

ইংরেজী ভাষার জন্য কয়েকজন ইংরেজ লেখককে আদর্শ বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড অথার্ বলে নির্দ্দেশ করা হয়েছিল। তাঁদের নাম হচ্ছে :—

পোপ্, কাউপার, স্কট্, ক্যাম্প্‌বেল্, এডিসন্, জন্‌সন্, গোল্ড্‌স্মিথ্, সাদী এবং ডিফো। এ ও বলে দেওয়া হয়েছিল যে পরীক্ষার অন্ততঃ দেড় বছর আগে কোন্ কোন্ বইয়ের কতটুকু পাঠ্য হ'বে তা' সিণ্ডিকেট্ ঘোষণা করবেন।

বাংলার নির্দ্দিষ্ট আদর্শ গ্রন্থগুলির নাম :—তোতা ইতিহাস, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনী, আরব্য রজনী ও রামায়ণ।

সংস্কৃতের জন্য—রঘুবংশ আর কুমারসম্ভব।

ইতিহাসের জন্য—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের বই-ই রইল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ববারে ছিল :—আউট্ লাইনস্ অফ্ জেনারেল্ হিষ্টোরী এজ্ কন্‌টেইনড্ ইন্ দি ফার্ষ্ট পার্ট অফ্ মার্সম্যানস্ ব্রিফ্ সার্ভে এবং মারে সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাস [১৮১৫ খৃঃ পর্য্যন্ত] ভূগোলের সাধারণ জ্ঞান এবং ভারতবর্ষের ভূগোলের বিশেষ জ্ঞান।

গণিতের পাঠ্যাংশ বাড়ানো হয়েছিল। ইউক্লিডের প্রথম তিন খণ্ডের পরিবর্ত্তে হয়েছিল চারখণ্ড।

নতুন নিয়ম করা হ'ল যে বিশেষ আদেশ না থাকলে সব বিষয়েরই উত্তর ইংরেজীতে লিখতে হ'বে। এর আগে কিন্তু এ নিয়ম ছিল না—নিয়ম ছিল যে ইতিহাস ও ভূগোলের এবং গণিতের উত্তর পরীক্ষার্থী যে কথিত ভাষায় পরীক্ষা দিচ্ছেন সেই ভাষাতেই লিখতে পারবেন।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আরম্ভ হ'বে পরীক্ষা। কোন্ কোন্ দিনে, কখন কখন হ'বে, সে সব সিণ্ডিকেট্ আগে থেকেই ঠিক্ করে দেবেন। এর আগে পরীক্ষার দিন ও সময় রেগুলেসন্ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হ'ত। ডিসেম্বরের প্রথম সোমবার আরম্ভ হ'ত পরীক্ষা। সময় ছিল—১০টা থেকে ১॥ টা এবং বিকাল ২টা হ'তে ৫॥ টা। আগেকার মতই ৪ দিন পরীক্ষা হ'তে লাগল। ষোল বছর বয়স না হ'লে কেউ পরীক্ষা দিতে পারবে না, এ নিয়ম আগেও ছিল, এখনও রইল। পরীক্ষার আবেদনপত্রের নির্দ্দিষ্ট ফরম্ ছিল না—ফরম্ হ'ল। পরীক্ষার অন্ততঃ ১৪ দিন আগে ফরম্ পূর্ণ করে রেজিষ্ট্রারের নিকট পহুঁছ নো চাই এই হ'ল নিয়ম।

আবেদন খানা সরাসরি রেজিষ্ট্রারের নিকট অথবা সিণ্ডিকেটের জানিত স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট পাঠা'তে হ'বে এই নিয়ম করা হ'ল।

মান-পত্রও পরিবর্ত্তিত হ'ল। আগে লেখা হ'ত:—"অমুক, নিজের ষোল বৎসর বয়সের এবং সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট্ উপস্থিত করেছিল এবং পরীক্ষকমণ্ডলী তা'কে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করেছেন।" এখন হ'তে মানপত্রে লেখা হ'তে লাগল—"অমুক......সালের......মাসে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং...বিভাগে স্থান পেয়েছে।"

১৬

তা'রপর—"এফ্, এ" পরীক্ষার কথা :—প্রবেশিকা বা এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'বার দু'বছর পরে এফ্-এ পরীক্ষা দেবার সময় হ'ল। পরীক্ষার্থীকে কোন স্কুল বা কলেজের [কেন না সে সময়ে স্কুল ও কলেজে বর্ত্তমান কালের মত পার্থক্য ছিল না] কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হ'তে তা'র সচ্চরিত্রতার এবং সে যে সেখানে পড়েছে এই মর্ম্মে সন্তোষজনক প্রমাণ পত্র উপস্থিত করতে হ'বে। সিণ্ডিকেট্ ইচ্ছা করলে, স্কুলের শিক্ষক ও স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেকটার্ পরীক্ষার্থীদিগকে এই নিয়ম হ'তে অব্যাহতি দিলেও দিতে পারতেন। ফি ছিল ১০৲ দশ টাকা। পরীক্ষার দিন হ'তে ৪র্থ সোমবার ফল বে'র হ'ত। দু'টী ছিল বিভাগ—প্রথম ও দ্বিতীয়।

পরীক্ষার সাব্জেক্ট্ বা বিষয়গুলি হ'ল এই :—

১। ভাষা—প্রবেশিকারই মত। ব্যাকরণ, অনুবাদ ও ইডিয়াম বা ভাষার রীতি সংক্রান্ত প্রশ্ন থাকবে। গদ্য ও পদ্য এই দু'রকম পৃথক্ প্রশ্ন থাকবে।

২। ইতিহাস—ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস ১৮১৫ পর্য্যন্ত। ভূগোলের জ্ঞানও থাকা চাই।

৩। গণিত ও পদার্থবিদ্যা—পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, প্ল্যান্ ত্রিকোণমিতি; মিকানিকস্।

৪। দর্শন—মেণ্টাল্ ও মরাল্ ফিলসফী। পরীক্ষা হ'বে চার

দিন। কখন কখন তা' সিণ্ডিকেট্ পূর্ব্বেই ঘোষণা করবেন। প্রথমে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে তারপর ডিসেম্বরের প্রথম সোমবার পরীক্ষা আরম্ভের দিন স্থির হয়।

—বি, এ—

নতুন নিয়মে এফ্, এ পাশ করবার এক বছর পরেই বি, এ পরীক্ষা দেওয়া যাবে এই ঠিক হ'ল। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল প্রবেশিকার চার বছর পরে বি, এ দেওয়া যাবে। কেননা, এফ্, এ পরীক্ষা তখন ছিল না; বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রথম তিন বছর বি, এ পরীক্ষা সম্পর্কে কেবল এই নিয়ম ছিল যে, যে কেহ, এই মর্ম্মে নিদর্শন পত্র উপস্থিত করতে পারবে যে সে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হয়েছে ও সে চরিত্রবান্ সেই, বি, এ পরীক্ষা দিতে পারবে। নতুন নিয়মে পরীক্ষার বিষয়াবলীর কোন পরিবর্ত্তন হ'ল না। আগেকার মতই রইল, পাঠ্যাংশের কিছু কিছু অদল বদল হ'ল মাত্র।

ভাষা—এন্ট্রান্স ও এফ্, এর মতই। ষ্ট্যাণ্ডার্ড অথার্ হ'লেন মিল্টন, স্যাক্স্পীয়ার্, ড্রাইডেন, পোপ্, ইয়ং, টমসন্, বেকন্, সুইফ্ট্, এডিসন্, জনসন্, গোলড্স্মিথ্, বার্ক, সাদী ও মেকলে।

১৮

বাংলা বইগুলির নাম হ'ল :—

বত্রিশ সিংহাসন, পুরুষ পরীক্ষা, বেতাল পঞ্চবিংশতি, প্রবোধ চন্দ্রিকা, মহাভারত, রামায়ণ, মেঘদূত, শকুন্তলা এবং অন্নদামঙ্গল।

সংস্কৃত—রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয়, বীরচরিত, উত্তররামচরিত ও মুদ্রারাক্ষস।

ইতিহাস—১। আইজ্যাক্ টেলারের ঐতিহাসিক প্রমাণ বা অনুরূপ গ্রন্থ।

২। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস ১৮১৫ পর্য্যন্ত।

৩। এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের ভারতের ইতিহাস ও ভৌগোলিক জ্ঞান।

অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যা—সংখ্যা-গণিত, বীজ-গণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, মিকানিকস্, হাইড্রোষ্ট্যাটিকস্, অপ্‌টিক্‌স্, এষ্ট্রোনমী, বিজ্ঞান বা ফিজিকাল সায়ান্স—কেমিষ্ট্রী (রসায়ন) এনিমেল ফিলসফী, ফিজিক্যাল্ জিওগ্রাফী।

দর্শন—মেণ্টাল্ এণ্ড্ মরাল্ সায়ান্স—লজিক্, মরাল্ ফিলসফী, মেণ্টাল্ ফিলসফী।

এখনকার বি, এর সঙ্গে তখনকার বি, এর একটা পার্থক্য ছিল এই যে, অন্যান্য প্রশ্নের সঙ্গে অনুবাদ, ব্যাকরণ, প্রয়োগ-রীতি বা ইডিয়াম্ সম্বন্ধে প্রশ্ন থাকত। এখন আর তা' থাকে

না। সংস্কৃত ও বাংলায় পুরাণো ব্যাকরণের বদলে হ'ল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেবের সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং রাজা রামমোহন রায় বা ডক্টর ইয়েট্‌সের বা শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়ের বাংলা ব্যাকরণ।

প্রশ্ন পত্রে নম্বর থাকৃত না। কোন কোনও বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান দেখাতে হ'ত। সে সব বিষয় হচ্ছে—লজিক্‌, ভারতের ইতিহাস, ভূগোল বা গণিত, মৌখিক পরীক্ষারও নিয়ম ছিল। নতুন নিয়মে তা' রহিত হ'ল, নতুন নিয়মে বি, এ, পরীক্ষা হ'তে লাগ্‌ল ছ' দিন। সকালে ১০—১॥, বিকালে ২—৫॥ টা। উত্তীর্ণের দু'টী বিভাগ হ'ল—প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ।

তারপর হ'ত অনার্স পরীক্ষা। তারপর—অনার্স

এম, এ—

প্রবেশিকার পর ৫ বছর গত হ'লে ও বি, এর ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হ'লে অনার্স দেওয়ার বিধি ছিল।

যে কেহ বি, এ পাশ করবার পরেই অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে এম, এ উপাধি পেতে পারতেন। এম্‌, এর জন্য কোন অতিরিক্ত পরীক্ষা বা ফিস্‌ দিতে হ'ত না।

তার পর অন্যান্য পরীক্ষাগুলির কথা :—

পরীক্ষা—	কোন্‌ পরীক্ষার কত পরে—
এল্‌, এল্‌—	এফ্‌, এর ২ বছর পরে।

বি, এল্— বি, এর ১ বছর পর।

ঐ অনার্স— বি, এর পরে ও এণ্ট্রান্সের ৬ বছর মধ্যে।

[পূর্ব্বে শেষের এ নিয়ম ছিল না]

ডি, এল্— বি, এল্, পাশের পর [ফিস্ ৫০৲ টাকা]

এল্, এম্, এস্ (প্রথম) প্রবেশিকার পর।

ঐ (দ্বিতীয়) প্রথমের ২ বছর পর।

(পূর্ব্বে ৩ বছর পর ছিল)

ঐ অনার্স— শেষ এল্, এম্, এসের প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হ'বার পর।

ডি, এম্,— বি, এর পর এল, এম, এস্ পাশ করে ২ বছর প্র্যাকটিস্ করার পরে।

এল্, সি, ই— এণ্ট্রান্স্ পাশের ৭ বছর অথবা এফ্, এর তিন বছর পরে।

এম্, সি,ই—বি, এ এবং এল্, সি, ই, পরীক্ষার পর এবং ২৪ বছর বয়স হ'লে, (পূর্ব্বের নিয়ম—এল্, সি, ই হ'বার ৪ বছর পরে এবং বি,এ পাশের ৪ বছর পরে)

পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষাগুলির প্রত্যেকটিরই নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য তালিকা ছিল।

তারপর :—

পরীক্ষার শুল্ক বা ফিস্ এবং ফল বের হবার সময়—এখনকার

তুলনায় তখনকার পরীক্ষার ফিস্ .খুব কম ছিল এবং পরীক্ষার ফল অনেক সকালে বের হ'ত। তখনকার পরীক্ষার ফিসের একটা তালিকা দিচ্ছি :—

এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ফিস্ ছিল—৫৲ টাকা, পরীক্ষার . ফল বের হ'ত পরীক্ষা আরম্ভের দিন হ'তে ঠিক চার সপ্তাহের শেষে। এফ্, এ পরীক্ষার ফিস্ ছিল—১০৲ টাকা। ঐ নিয়মে ফল বের হ'ত। বি, এর ফিস্ ছিল—২৫৲ টাকা। দু' সপ্তাহ পরেই ফল বের হ'ত। ঐ অনার্স, পরের সপ্তাহেই ফল বের হ'ত। বি, এল্ পরীক্ষার ফিস্ ছিল ২৫৲ টাকা, ফল বের হ'ত দু'সপ্তাহ পরে। ঐ অনার্সের পরের সপ্তাহেই। এল্, এল্, পরীক্ষার ফিস্ ছিল—২৫৲ টাকা। পনের দিন মধ্যে ফল বেরিয়ে যেত। এল্, এম্, এস্ প্রথম বা প্রিলিমিনারী পরীক্ষার ফিস্ ছিল মোটে ৫৲ টাকা। এক সপ্তাহেই ফল জানা যেত। ঐ ২য় পরীক্ষার ফিস্ ছিল ২৫৲ টাকা। তা'রও ফল এক সপ্তাহের পরেই বের হ'ত। ডি, এম্, পরীক্ষার ফল পরের সপ্তাহেই বের হ'ত। এম্, সি, ই, পরীক্ষার ফিস্ ছিল—২৫৲ টাকা। পনর দিন পর ফল বের হত, ঐ অনার্সের ফলও ঐরূপ বের হ'ত। প্রায় প্রত্যেকটী পরীক্ষাই নেওয়া হ'ত ডিসেম্বর মাসে না হয় জানুয়ারী মাসে। কেবল, এল্, এম্, এস্ ; এল্, সি, ই, এবং এম, সি, ই এইগুলির পরীক্ষা হ'ত মার্চ্চে।

পরীক্ষায় ফল প্রায় প্রত্যেক পরীক্ষারই কোন কোন বারের প্রাতে বের করা হ'ত।

প্রাচীন ও নবীন কালের পাঠ্য পুস্তকের তারতম্য বুঝাবার জন্য সেকালের একটা তালিকার খানিকটা তুলে দিচ্ছি :—

—এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পাঠ্য—

ইংরেজী পাঠ্য ছিল :—কাউপারের—টাইম্ পিস্, বিটির—মিনিষ্ট্রেল্, বুক্ ওয়ান্ ও হারমিট্।

প্রেসক্রক্‌টের—হিষ্টোরী অফ্ ফার্ডিনাণ্ড্ এণ্ড্ ইসাবেলা [সিলেক্‌সনস্]

ফ্র্যাঙ্কলিন্—অটোবাইওগ্রাফী।

বাক্‌লন—ন্যাচারাল্ হিষ্টোরী (সিলেকসনস্) মিরেজ্ অফ্ লাইফ (গ্রন্থকার অজ্ঞাত) তারপর সংস্কৃত :—

সংস্কৃতে পাঠ্য ছিল—১। রঘুবংশ ১—৯ সর্গ।

২। বিক্রমোর্ব্বশী।

বাংলায় :—

চারু পাঠ—৩য় ভাগের কয়েকটী অধ্যায়।

জীবন চরিত—গ্যালিলিও, লিনিয়াস্, উইলিয়াম্ জোন্স।

বাঙ্গালা বিশ্বকোষ—নির্দ্দিষ্ট অধ্যায়।

—•—

এফ, এ'র (First Ex. in Arts) ইংরেজী পাঠ্য—

ইংরেজী পাঠ্য ছিল :—

এডিসনের—ক্যাটস্।

মিলটনের—প্যারাডাইজ্ লষ্ট্ ১।২।৩।

পোপের—টেম্পল্ অফ্ ফেম্।

স্কটের—মীরাণ্ডার ফার্ষ্ট ক্যাণ্টোর ইনট্রোডাকসন্ বা ভূমিকা।

এডিসনের—স্পেক্টেটারের ৮০টী প্রবন্ধ।

বেকনের—ইনট্রোডাকসন্ টু দি রেষ্টোরেসান্ অফ্ লার্ণিং।

সংস্কৃতে ছিল—কিরাতার্জ্জুনীয় এবং মুদ্রারাক্ষস।

বাংলায় ছিল—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহাভারতের উপক্রমণিকা,

বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা বিশ্বকোষ, ষষ্ঠ খণ্ড, ১—৭৯ পৃষ্ঠা।

—বি, এ'তে কি ছিল বলছি :—

ইংরেজী ছিল বি, এতে—স্কাক্স্পীয়ারের কিং লীয়ার।

মিলটনের—এগোনিষ্টিস্, লিসিডাস্।

স্কটের—লেডি অফ্ দি লেক্।

বেকনের—এসেস্ (Selections)

কষ্টারের—এসেস্ (Selections)
বাংলার বই ছিল—মেঘদূত, বাহ্যবস্তু, নবনারী।
সংস্কৃতে ছিল—কিরাতার্জ্জুনীয়, বীরচরিত।
বিশ্ববিদ্যালয় এগুলি ছাপতেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন গঠন প্রণালী

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'বার দু'বছর পরে অর্থাৎ ১৮৫৯ সালের গঠন প্রণালী ছিল কেমন জানতে হয় তো কৌতূহল হ'তে পারে। তখনও সিনেট্ ছিল—সিনেটের সভ্য ছিলেন; চ্যান্সেলার, ভাইস্ চ্যান্সেলার প্রভৃতি ছিলেন।

চ্যান্সেলার, ভাইস্ চ্যান্সেলার ও ৭ জন এক্স্‌অফিসিও অবশ্য সভ্য নিয়ে মোট সভ্যের সংখ্যা ছিল তখন ছ'চল্লিশ জন।

বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিম অর্থাৎ বর্ত্তমান আগ্রা ও অযোধ্যা এবং যুক্ত প্রদেশের ছোট লাট বা লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ গভর্ণরদ্বয়, বঙ্গদেশের সুপ্রীম্ কোর্টের প্রধান বিচারপতি বা চিফ্ জাষ্টিস্, কলকাতার লর্ড বিসপ, . ভারত গবর্ণমেণ্টের সুপ্রীম্ কাউন্সিলের সভ্যগণ ছিলেন মেম্বার বা সভ্য।

সিনেটে ছিলেন মাত্র ছয় জন ভারতবাসী :—প্রিন্স্ গোলাম

মোহাম্মদ, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর,রামপ্রসাদ রায়, মৌলভী মোহাম্মদ ওয়াজী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাম গোপাল ঘোষ।

সিণ্ডেকেটের সভ্য সংখ্যাও ছিল ৬। একমাত্র ভারতীয় ছিলেন—রামপ্রসাদ রায়।

ফ্যাকাল্‌টি অফ্‌ আর্টস্‌ বিভাগে ছিলেন ২০ জন সভ্য। সভাপতি ছিলেন লর্ড বিসপ্‌। এর তিন জন ছিলেন ভারতীয়—বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অন্য দু'জন।

আইনের ফ্যাকালটীতে ছিলেন, সভাপতি ভিন্ন নয় জন। তিন জন ভারতীয়। ডাক্তারা ও ইঞ্জিনায়ারীংয়ের সভ্য সংখ্যা ছিল ৫ ও ১০। একজনও ভারতীয় ছিলেন না।

এ বছর (১৮৫৯) আর্টসের পরীক্ষক ছিলেন ১১ জন। ভারতীয় ২ জন, একজন হচ্ছেন রেভারেণ্ড্‌ কে, এম্‌, ব্যানার্জ্জী। ইনি কলকাতা বিসপস্‌ কলেজের অধ্যাপকতা করতেন এবং সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া ভাষার পরীক্ষক ছিলেন। অন্য জন ছিলেন কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়। ইনি বাংলার পরীক্ষক ছিলেন।

তারপর :—ডাক্তারীর ২ ও ৪ জন পরীক্ষক ছিলেন ইউরোপায়ান্‌।

১৮৬১ সালে সিনেটের সভ্য সংখ্যা বাড়ানো হয়—৬৫টীতে দাঁড়ায়। একজন অতিরিক্ত ভারতবাসী নির্দ্দিষ্ট হন, রেভারেণ্ড্‌

কে, এম, ব্যানার্জ্জী। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হন মোট ২৮ জন। তা'র ২ জন মাত্র ছিলেন ভারতবাসী। একজন এডুকেশন গেজেটের সহকারী সম্পাদক কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; ইনি ছিলেন বাংলার পরীক্ষক, আর দ্বিতীয় জন রেভারেণ্ড, কৃষ্ণমোহন করতেন সংস্কৃত, হিন্দী, উড়িয়া ভাষার পরীক্ষা আগেরই মতন। বাংলার অপর পরীক্ষক ছিলেন এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক রেভারেণ্ড ওব্রিয়েন স্মিথ্।

আরবী, পারসী, উর্দ্দুর পরীক্ষক ছিলেন ইউরোপীয়ান,। ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ও পদার্থ বিদ্যার এবং আইনের সকল বিষয়ের প্রত্যেকটীতে দু' দু'জন পরীক্ষক ছিলেন।

এখনকার তুলনায় তখনকার দিনে কত ছাত্র পরীক্ষা দিতেন শুনলে হাসি পায়; ৪ বছরের নমুনা দিচ্ছি :—

—এণ্ট্রান্স পরীক্ষা :—

১৮৫৭ সালে পাশ ১৬২, পরীক্ষার্থী ২২৪; ১৮৫৮ সালে পাশ ১১১, পরীক্ষার্থী ৪৫৫; ১৮৫৯ সালে পাশ ৫৮৩, পরীক্ষার্থী ১৪১১; ১৮৬০ সালে পাশ ৪১৯; পরীক্ষার্থী ৮০৯; ১৮৬১ সালে পাশ ৪৭৭, পরীক্ষার্থী ১০৫৮।

১৮৫৮ সালে দু'বার পরীক্ষা হয়।

—এফ্, এ :—

প্রথম পরীক্ষা—১৮৬১ সালে পাশ ৯৪, পরীক্ষার্থী ১৬৩।

তারপর বি, এর অবস্থা দেখ :—

পাশ ২, পরীক্ষার্থী ১৩; পাশ ১০, পরীক্ষার্থী ২০; পাশ ১৩, পরীক্ষার্থী ৬৫; পাশ ১৫, পরীক্ষার্থী ৩৯ জন।

এম, এর ফল হয়েছিল—১৮৬১ সালে ১ জন দিয়েছিলেন, তিনিও ফেল করেন।

বি, এল্, পরীক্ষায় ১৮৫৮ সালে পাশ ১১, পরীক্ষার্থী ১৯ জন, ১৮৫৯ সালে পাশে ৩,পরীক্ষার্থী ২০ জন, ১৮৬০ সালে পাশ ১০, পরীক্ষার্থী ২২ জন, ১৮৬১ সালে পাশ ৮, পরীক্ষার্থী ১৭ জন।

এল্, এল্, পরীক্ষা ১৮৬১ সালে প্রথম গৃহীত হয়। ৮ জনের মধ্যে ৭ জন পাশ করেন; ৬ জন ছিলেন বি, এল পরীক্ষার্থী।

এল্, এম্, এস্ প্রথম ১৮৫৭ সালে পাশ ১২ জন, পরীক্ষার্থী ১২ জন; ১৮৫৮ সালে পাশ ২৪ জন; পরীক্ষার্থী ৪০ জন; ১৮৫৯ সালে পাশ ১২ জন, পরীক্ষার্থী ৩১ জন, ১৮৬০ সালে পাশ ৭ জন, পরীক্ষার্থী ৩১ জন; ১৮৬১ সালে পাশ ৭ জন, পরীক্ষার্থী ১৬ জন।

—এল্, এম্, এস :—

দ্বিতীয় পরীক্ষা। ১৮৬১ সালে পাশ করেন ২৩ জনের মধ্যে

১৪ জন। এল্‌, সি, ই তে ১৮৬১ সালে ১০ জনের মধ্যে ৬ জন।

এই তো গেল প্রাচীন গঠনভঙ্গী। তা'রপর স্কুল ও কলেজ-গুলিকে এফিলিয়েটেড্ বা অন্তর্ভুক্ত করতে হ'লে কি কি করতে হ'ত সে কথাও একটু বলছি।

এখনকার মত তখন স্কুল কলেজের এফিলিয়েসন্ নেওয়া এত কঠিন ছিল না। এফিলিয়েসনের আবেদনের সঙ্গে একটি বিবরণ-পত্র দিতে হ'ত। সেই বিবরণ-পত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের পরিচয় এবং গত দু'বছরে যে যে বিষয় অধ্যাপনা হয়েছে তা'র বর্ণনা দিতে হ'ত। বিদ্যালয়ের পরিচালক বা অধ্যক্ষ কিংবা হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের এই স্বীকারোক্তি করতে হ'ত যে বি, এ, পর্য্যন্ত পড়াবার আবশ্যক সম্বল ঐ বিদ্যালয়ের আছে। সেই অঙ্গীকার পত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের কাছে পাঠাবার পূর্ব্বে অন্ততঃ দু'জন সিনেটের সভ্য উহা সমর্থন করে ওতে সই করতেন।

১৮৬১ সালে অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৯টী। এর ১১টী ছিল গভর্ণমেণ্ট্ সংশ্লিষ্ট, অন্য ৮টী বে-সরকারী।

—প্রথম শ্রেণীর ছিল :—

১। প্রেসিডেন্সী কলেজ—[সাধারণ ও আইন]

২। মেডিক্যাল্ কলেজ
৩। সিভিল্ ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজ
৪। হুগলী কলেজ
৫। কৃষ্ণনগর কলেজ
৬। ঢাকা কলেজ
৭। বহরমপুর কলেজ
৮। আগ্রা কলেজ
৯। বেণারস কলেজ
১০। সাগর স্কুল (Saugor school)
১১। সংস্কৃত কলেজ

—দ্বিতীয় শ্রেণার অর্থাৎ বে-সরকারী—

১২। কলকাতা বিসপস্ কলেজ
১৩। ডাভ্‌টন্ কলেজ
১৪। সেন্ট্‌পলস্ স্কুল
১৫। ফ্রিচার্চ্চ ইনষ্টিটিউসন্
১৬। লা মার্টিনিয়ার কলেজ
১৭। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর বিত্তালয়
১৮। শ্রীরামপুর কলেজ
১৯। কুইনস্ কলেজ

ক্রমে এই সংখ্যা বাড়তে লাগল। বাড়তে বাড়তে এখন যা' হয়েছে তা' পরে বলছি। মাঝখানকার একটা হিসাব শুনে একটু ভাব। এ হচ্ছে ১৮৯৫ সালের হিসাব।

এ বছর—

বি, এ, পর্য্যন্ত পড়ানো হয় এমন কলেজ হ'ল ৫৮ টী

এফ্, এ,......	৪০টী
আইন......	৪০ „
ডাক্তারী......	১ (মেডিক্যাল কলেজ)
ইঞ্জিনীয়ারীং......	২ [রুড়কী ও হাওড়া]

বাংলার বাইরে ও বাংলার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত বহু কলেজ ছিল। আগ্রায় ছিল, কাশীতে ছিল, জব্বলপুরে ছিল, বেরিলিতে ছিল, কলম্বোয় ছিল, অমৃতসরে ছিল, সিমলা, কটক, কান্দী (সিংহল), নাগপুর, ইন্দোর, রেঙ্গুন, বাটিকানোয়া (সিংহল) মোরাটুয়া, জাফ্না (সিংহল), মুশৌরী, আলিগড়, আলমোরা, আজমীর ইত্যাদি স্থানেও এর অন্তর্ভুক্ত স্কুল ও কলেজ ছিল। পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ হ'তে উত্তরে নেপাল, পশ্চিমে পাঞ্জাব, দক্ষিণে সিংহল অবধি ছিল কলকাতার অধিকার।

শুনলে তোমরা বিস্মিত না হয়ে পারবে না যে তোমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও সভ্যতা প্রসারিত হয়েছিল একদিন :

আসামের	২৩টী বিদ্যালয়ে
বিহারের	৫৪ ,,
ব্রহ্মদেশের	২৪ ,,
কাশ্মীরের	১ ,,
মধ্যভারতের	১২ ,,
মধ্যপ্রদেশের	১৩ ,,
সিংহলের	১৬ ,,
ছোটনাগপুরের	৬ ,,
নেপালের	১ ,,
উত্তর পশ্চিম ও অযোধ্যার	১৬ ,,
লক্ষ্ণৌর	৯ ,,
উড়িষ্যার	৯৩ ,,
পাঞ্জাবের	৪৭ ,,

সুদূর পাঞ্জাবের সিমলা, কর্পূরতলা, পাতিয়ালা, পেশোয়ার, ডেরা ইস্মাইল খাঁ, গুজরাট, মুলতান ইত্যাদি স্থলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত স্কুল ও কলেজ ছিল অনেক—ভাবলে কা'র না আনন্দ হয়?

১৯৩৪ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১২৬৮৭ জন ছাত্র ও ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছিল।

বর্ত্তমানে শিক্ষায়তন চার ভাগে বিভক্ত হয়েছে—প্রাথমিক,

মাধ্যমিক, কালেজীয় ও পোষ্ট্ গ্র্যাজুয়েট্। সারা ভারতে হয়েছে ১৮টী বিশ্ববিদ্যালয়!

২৩টি শিক্ষণীয় বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অলঙ্কৃত হয়েছে, ২৫৫ জন আছেন অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক, বার্ষিক ব্যয় হচ্ছে—৩৭ হ'তে ৩৮ লাখ টাকা, সরকার দিচ্ছেন ৫ লাখেরও কম।

এত দিনের বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টাতেও মোসলমান ভ্রাতৃগণ সমধিক উন্নতির পরিচয় দিতে পারেন নি। ইংরেজীর উপর তাঁ'দের অনাশক্তিই এর হয় তো কারণ। ইংরেজী ভাষা শিক্ষায় হিন্দু ও মোসলমান পুরুষের অনুপাত ৫ ও ১। স্ত্রীলোকের ১৩ ও ১।

শিক্ষার সমধিক বিস্তৃতি ও সকলে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে প্রাণের সহিত গ্রহণ করেন, তা' হ'লে আমাদের এই দেশের হিন্দু-মোসলমানের বুদ্ধি-বিবেচনা সংবর্দ্ধিত হ'য়ে আমাদের সকলেরই যে অশেষ মঙ্গল ঘটবে শুধু তাই নয়, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিও হ্রাস পাবে সন্দেহ নেই। সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য চল্‌তে থাকলে বাংলার হিন্দু মোসলমান উভয়েই অধঃপাতে যাবে। হিন্দু ও মোসলমানই বাংলার প্রাণ। মোসলমানের সংখ্যা ২ কোটী ৫৪ লক্ষ। অ-মোসলমান ২ কোটী ২১ লাখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

"ঐ পোহাইল তিমির রাতি ;
পূর্ব্ব গগনে দেখা দিল নব প্রভাতচ্ছটা,
জীবনে, যৌবনে, হৃদয়ে বাহিরে
প্রকাশিল অতি অপরূপ মধুর ভাতি।"

—রবীন্দ্রনাথ—

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐশ্বর্য্য

ছোট হ'তেই হয় বড়, কিন্তু খুব ছোট যদি খুব বড় হয়ে উঠে তা'হ'লেই লোকে তা'কে দেখে বিস্মিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছোট ছিল, কিন্তু কত বড় যে হয়েছে, ভাবলে বিস্ময়ে যেমন হৃদয় স্তম্ভিত হ'তে থাকে, তেমনই বাঙ্গালীর এই মহত্তোমহীয়ান্ প্রতিষ্ঠানের বিপুল ঐশ্বর্য্য ও মহিমার কথায় মহা আনন্দের উদয় হয়।

বাংলার ইহা পরম গৌরবের সামগ্রী। বাঙ্গালীর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বড় বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র ভারতে কেন, এশিয়ায়, পূর্ব্ব গোলার্দ্ধে বা পশ্চিম গোলার্দ্ধেও আর নেই। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইদানীং সৃষ্টি হয়েছে সত্য, কিন্তু এমন আর একটী আজও হয়নি। শত শত স্কুল ও কলেজ এর অধীনতা পাশ মুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বটে, তবু এর প্রাধান্য, এবং ছাত্র-সংখ্যা প্রায় সমভাবে অতুলনীয়ই হয়ে রয়েছে।

পূর্ব্বেই বলেছি, বিশ্ববিদ্যালয়টা ছিল কেবল সার্টিফিকেট্ দেওয়ার কায নিয়ে; পরীক্ষা নিত আর মানপত্র দান করত। তা'ছাড়া বড় কিছু কায ছিল না এর কিন্তু বাঙ্গালীর পরম সৌভাগ্যক্রমে বাংলার মহামনস্বী সন্তান স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয় এবং কর্ণধারত্ব গ্রহণ করেই একে শিক্ষা প্রদানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করে তুলেছেন। বললে অত্যুক্তি হয় না যে এর মটো "Advancement of Learning" সার্থক হয়ে উঠেছে তাঁরই চেষ্টায়। এতে বড় লাট লর্ড কার্জ্জনের হস্তক্ষেপও চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে সন্দেহ নেই।

কলকাতার এলাকায় অসংখ্য মনস্বী ব্যক্তি এর উন্নতির চেষ্টায় সতত নিযুক্ত আছেন। ফলে দিন দিন এর বিশেষ উন্নতি হচ্ছে।

—সিনেট্ হাউস্—

সিনেট্ হাউসই হ'চ্ছে একমাত্র সরকারী বাড়ী, যা' ভারত গভর্ণমেণ্ট্ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন। ১৮৫৭ সালে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় তখন তার নিজের কোন বাড়ী ছিল না। ভাড়াটে বাড়ীতে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কায চালাতে হত। ১৮৬৪ সালে বর্ত্তমান সিনেট্ হাউসের জন্য জায়গা ঠিক করা হয়। বাংলার পাব্লিক্ ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের উপর উক্ত বাড়ী নির্ম্মাণের ভার দেওয়া হয়। তাঁরা তখন ২,৫২,০০০ দু'লাখ বায়ান্ন হাজার টাকা বরাদ্দ পেশ করেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট্ তাঁদের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করতে বলেন এবং বর্ত্তমান সিনেট্ হাউস্ ৪,৪৩,০০০ চার লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৮৭২ সালে নির্ম্মিত হয়। ১৮৭৩ সালের প্রথমেই এই বাড়ীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যালয় স্থানান্তরিত হয়। বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যালয় এই বাড়ীতে নেই। কেবল পরীক্ষা গ্রহণ ও সভাদির অধিবেশনের জন্যই ইহা ব্যবহৃত হচ্ছে।

এখন, এর কতই যে উন্নতি হয়েছে, সে সব না দেখলে বুঝি বুঝানো যায় না। যাঁ'রা আগে দেখেছেন, এখন দেখলে অবাক্ হ'য়ে যা'বেন সন্দেহ নেই। সিনেটের ভিতরের হলটী দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০০ ফিট্ এবং প্রস্থে ৬০ ফিট্, হলের মধ্যে গেলে

দেখতে পাওয়া যায় বহু বিখ্যাত মহাপুরুষের অর্দ্ধাবয়ব প্রস্তর মূর্ত্তি এবং মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রভৃতি বিবিধ প্রতিকৃতি। সিনেটের সোপান শ্রেণীর উপর বারান্দায় যে মর্ম্মর প্রস্তর মূর্ত্তিটা আছে উহা "ঠাকুর ল লেক্‌চার্" বৃত্তির প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা প্রসন্নকুমার ঠাকুর সি, এস্, আই মহাশয়ের। হলে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও স্যার্ গুরুদাস ব্যানার্জ্জীর অবিকল মর্ম্মর প্রস্তরের মূর্ত্তি রয়েছে। বিখ্যাত দাতা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ, স্যার্ রাসবিহারী ঘোষ, স্যার্ তারক নাথ পালিত, স্যার্ আশুতোষ মুখার্জ্জী ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ দানশীল ব্যক্তিবর্গের পূর্ণাবয়ব তৈল-চিত্র সংরক্ষিত হয়েছে। সিনেট্ হলে বসায় ছেলেদের পরীক্ষা গৃহীত হয়। ১,৫০০ ছাত্র বসে পরীক্ষা দিতে পারেন।

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, স্যার্ রমেশ চন্দ্র মিত্র, স্যার্ চন্দ্রমাধব ঘোষ ও ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় প্রভৃতির চিত্রও এর শোভা বৃদ্ধি করেছে।

—দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং—

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট্ হাউসের পশ্চিম দিকে ৮,০০,০০০ আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে পাঁচতলা বিশাল সৌধ গড়ে উঠেছে, ঐ বিশাল সৌধ ১৯০৯ সালে স্যার্ আশুতোষেরই চেষ্টায় যে হয়েছে, তা' শুনে হয় তো সকলেই সুখী হ'বে। বাঙ্গালীর

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালী ভাইস্ চ্যান্সেলার স্যার্ আশুতোষ শুধু এই দ্বারভাঙ্গা বিলডিং নির্ম্মাণ করায়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, তাঁর অসাধারণ মাহাত্ম্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যা' কিছু উন্নতি প্রায় সবই ঘটেছে।

বলতে গেলে তাঁরই চেষ্টায় দ্বারভাঙ্গার মহারাজা স্যার্ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর বিগত ১৯০৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয় সংস্থাপনের জন্য ৪, ৫০ ০০০, চার লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন। তাঁর এই পুণ্যস্মৃতি রক্ষা কল্লে তাঁরই নামে এক বিরাট সৌধ প্রতিষ্ঠিত হয়। গভর্ণমেণ্ট দেন ২, ০০, ০০০ লক্ষ টাকা তদ্ভিন্ন যে অর্থের প্রয়োজন হয় তা' বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল হ'তে গ্রহণ করা হয়। এই বিশাল অট্টালিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয়, ল কলেজ্ এবং অফিস্ সংস্থাপিত হয়েছে। তা'ছাড়া এর পাঁচ তলায় রয়েছে ৭০০ সাত শত ছাত্রের পরীক্ষা দেবার মত জায়গা। এর কথা পরে আরও বল্‌ছি।

—হার্ডিং বা হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল—

একটী বিরাট পাঁচতলা বাড়ীতে হার্ডিং হোষ্টেল স্থাপিত হয়েছে। কলুটোলা ষ্ট্রীট্ হ'তে দ্বারভাঙ্গা বিলডিং অবধি দেড় বিঘা জমির উপর এই বিপুলকায় সৌধ নির্ম্মিত হয়ে স্যার্

আশুতোষের অমর কীর্ত্তি ঘোষণা করছে। বড়লাট লর্ড হার্ডিংয়ের নামানুসারেই এই হোষ্টেলটীর নাম হয়েছে হার্ডিং হোষ্টেল। জমির মূল্য দেড় লাখ টাকা আর অট্টালিকাখানির মূল্য ৪ চার লাখ টাকা, গভর্ণমেণ্ট্ এই অট্টালিকা নির্ম্মাণের জন্য দিয়েছেন তিন লাখ টাকা। দেড়শ' ছাত্র এই বাড়ীতে অনায়াসে, সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ল কলেজের ছাত্রেরাই এখানে থাকেন।

—আশুতোষ বিল্ডিং—

সিনেটের দক্ষিণে এই বিরাট সৌধ নির্ম্মাণও স্যার্ আশুতোষেরই উদ্যোগে ১৯২২ সালে আরম্ভ হয়। আগে এই স্থানে মাধব বাবুর বাজার ছিল। তিন বিঘা জমি—সরকারী ৮ লাখ টাকায় খরিদ করা হয়, ৩, ১৭, ৬১৫ টাকা ব্যয়ে ১৯২৬ সালে এই সৌধ নির্ম্মাণ পরিসমাপ্ত হয়। স্যার্ আশুতোষের তিরোধানের পর তাঁ'রই পুণ্য নামে এই সৌধ উৎসর্গীকৃত হয়। ১৯২৭ সালে-১, ৯৫০, ০০ টাকায় ত্রিতল নির্ম্মিত হয়। সব টাকাই গভর্ণমেণ্ট্ দিয়েছিলেন।

তা'রপর ১৯২৮ সালে হয় এর চার তলার পূর্ব্বদিক্। ৬ বছর পরে স্যার আশুতোষের কৃতী বংশধর শ্রীযুক্ত শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে এর চার তলার অপরাংশ।

এই সৌধে পোষ্ট্ গ্র্যাজুয়েট্ আর্টস্ বিভাগের কলেজ, বিশাল পুস্তকালয় ও ৮০০ আটশ' লোক বসতে পারে এমন 'আশুতোষ হল্' নির্ম্মিত হয়েছে, বহু গবেষণাযোগ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ আশুতোষ মিউজিয়ামও বিশ্ববিদ্যালয়ের এক স্মরণীয় ঐশ্বর্য্য সন্দেহ নেই।

—বিশ্ববিদ্যালয়-লাইব্রেরী—

বহুদিন আগেকার কথা। একাত্তর বছর হ'তে চল্ল, ১৮৬৯ সালের ২০শে জুলাই তারিখে উত্তরপাড়ার রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী স্থাপন করবার জন্য ৫০০০৲ টাকা দান করে যান। তা'রপর ১৮৭৪ সালে এই লাইব্রেরীর জন্য ৯০০০৲ টাকা ব্যয় করে একে সুবৃহৎ আকারে পরিণত করা হয়।

এতে এখন আছে—এক লাখেরও বেশী নানাভাষা ও নানা বিষয়ের বই। স্যার্ আশুতোষের চেষ্টায় বাংলা ভাষার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমধিক দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় সম্প্রতি বাংলা ভাষার বহু প্রাচীন পুঁথি এই লাইব্রেরীতে সংগৃহীত হয়েছে, ডক্টর ফিচেল্ [Dr. Fischel] এবং ডক্টর ডানের [Dr. Dunn] গ্রন্থালয় এখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯০৯ সালে ল কলেজের লাইব্রেরীও এই স্থানে স্থাপিত হয়েছে।

তাঁতেও ৩৮, ৪৪২ খানা পুস্তক আছে। দিন দিন সংখ্যা বাড়ছে, কালে কি হ'বে কে জানে? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানাও একটা বিরাট ব্যাপার। বহু বই, বহু কাগজ রাতদিন ছাপা হচ্ছে।

কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয় "উমা ঘোষ সংগ্রহ"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বঙ্গ মহিলা লেখিকা-গণের বহু পুস্তক "উমা ঘোষ সংগ্রহে" রক্ষিত আছে। ভবানীপুর পদ্মপুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার কন্যার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রায় তিনশত মহিলার লিখিত পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সযত্নে পৃথক আধারে "উমা ঘোষ সংগ্রহ" নামে পুস্তক-গুলি রাখিয়াছেন। অনেক দুষ্প্রাপ্য ও লেখিকাদের স্বাক্ষরযুক্ত পুস্তক এবং হস্তলিপি এই সংগ্রহে আছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ তাঁহার কন্যার ৫ম বার্ষিক স্মৃতি উপলক্ষে পুনরায় ২৫খানি পুস্তক প্রদান করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৭০ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত ও মুদ্রিত স্বর্গীয়া প্রসন্নময়ী দেবীর পুস্তক রহিয়াছে। অনেক লেখিকা (ইন্দিরা দেবী, হেমলতা ঠাকুর, স্বরমা ঘোষ, মহারাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী মহোদয়াগণ) তাঁহাদের পুস্তক প্রদান করিয়াছেন।

—কলকাতা ইউনিভারসিটী ইনষ্টিটিউট্—

প্রথম যখন কলেজ্ স্কোয়ারের পূর্বদিক্ করে এই প্রতিষ্ঠানটী গড়ে ওঠে তখন এর নাম ছিল "সোসাইটী ফর দি হাইয়ার ট্রেনীং অফ্ ইয়ং মেন্" তা'র পর—১৮৮৫ সালে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক রেভারেণ্ড্ প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান নামকরণ করেন, এবং হিন্দু স্কুলেই এর কার্য্য নির্ব্বাহ হ'তে থাকে। বিগত ১৯১৫ সালে লর্ড কারমাইকেল্ বাহাদুর বর্ত্তমান অট্টালিকার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই অট্টালিকা নির্ম্মাণে প্রায় তিন লাখ টাকারও উপর খরচ হয়, এবং সে খরচের গভর্ণমেণ্টই বহন করেন, অনেকাংশ। বর্দ্ধমানের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর দেন ৫০,০০০৲ টাকা। সে টাকায় হয় আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় যত কিছু, এই ইনষ্টিটিউটে একটী সুন্দর পড়বার ঘর আছে, বিলিয়ার্ড রুম্ আছে লঞ্জ (Lounge) এবং জিম্‌নাসিয়াম্ আছে। সেখানে এর সভ্যগণ খেলেন। ভিতরকার হলটী অতি চমৎকার এবং একযোগে ১৫০০ লোকের বসবার জায়গা হয় এমনতর বিস্তৃত। মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক উন্নতি বিধানের জন্য এই স্থানটী অতি মনোরম।

—বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাপর হোষ্টেল সমূহ—

সিনেটের সংশ্লিষ্ট এই সব বড় বড় সৌধ ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট্ বিশ্ববিদ্যালয়কে বিদ্যাসাগর হোষ্টেল [কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্]

রামমোহন হোষ্টেল [আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্] ক্যানিং হোষ্টেল [স্কটস্ লেন্] রিপন্ হোষ্টেল [হ্যারিসন্ রোড্] ও সেণ্ট্ জেভিয়ার হোষ্টেলের সুবৃহৎ ও মনোরম ছাত্রাবাস গুলি দান করেছেন। ইডেন, বেকার ও কারমাইকেল হোষ্টেলও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

—বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়ান্স্ কলেজদ্বয়—

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সায়ান্স্ কলেজটীর স্থান, সিনেটের নিকট সঙ্কুলান না হওয়ায়, উহা স্থাপিত হয়েছে ৯২ নং আপার্ সার্কুলার রোডে—এক নয়, দুই নয়, আঠার বিঘা জমির উপর। বিরাট, বিপুল, বিশাল সে অট্টালিকা। সেখানে ফিজিক্স্ ও কেমেষ্ট্রি বিভাগ, ল্যাবরেটরী বা রসায়নাগার ও কারখানা সংস্থাপিত হয়েছে। এই সৌধ নির্ম্মাণে ৫০, ৫০,০০০ টাকারও উপর ব্যয় হয়েছে।

এর একটী অংশ স্যার্, পি, সি, রায়, Annexe নামে গত ১৯৩২ সাল হ'তে অভিহিত হচ্ছে। বহু লক্ষ টাকা এতে ব্যয় হয়ে গেছে। দিন দিন—উত্তরোত্তর এর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় বেড়েই চলছে। ১৯১৪ সালের ২৭ শে মার্চ্চ স্যার্ আশুতোষই এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমেই ৫,৩০,০০০৲ টাকা এর নির্ম্মাণ ব্যয় হয়েছিল। এখনও হচ্ছে। স্যার

স্যার জগদীশচন্দ্র

স্যার প্রফুল্লচন্দ্র

তারক নাথ দিয়েছিলেন ১৫ লাখ, স্যার রাসবিহারী ১০ লাখ।

দ্বিতীয় সায়ান্স্ কলেজটী নির্ম্মিত হয়েছে :—
৩৫ এ, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে ; ~৪ বিঘা জমির উপর দুইটী ত্রিতল ও চারিতল বাটীতে এই সৌধ নির্ম্মিত হয়েছে। এই সৌধটী ছিল বিখ্যাত দানবীর স্যার্ তারকনাথ পালিতের নিজ বসতবাটী। এর মূল্য শুনেছি ছ' লাখ টাকা।

—বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তর—

এইবার বল্‌ব—বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরের কথা। প্রথমেই বলে নিচ্ছি এর প্রধান প্রধান অধ্যাপক পদ গুলির কথা; সংক্ষেপ ভিন্ন উপায় নেই। পুঁথি বেড়ে যা'বে—তা' ছাড়া এর সীমাও নেই—নিত্য নতুন হচ্ছে কত কিছু!

—ঠাকুর ল প্রফেসার পদ—

এ হচ্ছে ১৮৭০ সালে স্থাপিত। ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত বার্ষিক ১২০০০. টাকা দানের উপর এই পদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইদানীং ৯০০০. টাকা করে দেওয়া হয়। বহু বিখ্যাত ব্যবহারজীবী এই বৃত্তি পেয়ে প্রফেসারী করে গেছেন। নিজেরাও উপকৃত হয়েছেন, উপরন্তু বহু উপযুক্ত ছাত্র গড়ে তুলে দেশের পরমোপকার করেছেন ও করছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে স্যার্ আশুতোষের সুযোগ্য পুত্র রমাপ্রসাদ এই পদ অলঙ্কৃত করেছেন।

—মিণ্টো প্রফেসার—

বিগত ১৯০৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবিলী উৎসব হয়। তখনকার চ্যান্সেলার ও ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল্ ছিলেন লর্ড মিণ্টো। তাঁ'র স্মৃতির উদ্দেশ্যে সেই পরমানন্দের উৎসবে এই প্রফেসার পদের প্রথম উদ্ভাবন করা হয়। গভর্ণমেণ্ট এই উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে ১২,০০০্ টাকা দান করেন। তা'রই উপর ভিত্তি করে এই অধ্যাপক পদের প্রবর্ত্তন হয়। ডক্টর প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জী এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

—জর্জ্জ দি ফিফ্থ্ প্রফেসার—

বিগত ১৯১১ সালে, সম্রাট্ জর্জ্জ দি ফিফথের করোনেশন বা রাজ্যাভিষেকের স্মৃতিরক্ষা কল্পে দর্শন শাস্ত্রের জন্য এই প্রফেসার পদের সৃষ্টি হয়। বার্ষিক ১২০০০্ টাকা এতদর্থে গভর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালকে দান করে থাকেন, ডক্টর আদিত্যনাথ মুখার্জ্জী এই পদে অধিষ্ঠিত হন।

—হার্ডিং বা হার্ডিঞ্জ প্রফেসার—

বিগত ১৯১১ সালে বড়লাট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার লর্ড হার্ডিংয়ের স্মৃতিরক্ষা কল্পে এই প্রফেসার পদের সৃষ্টি হয়।

ইহা অঙ্ক শাস্ত্রের জন্যই স্থাপিত হয়েছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গণেশ প্রসাদ এই পদ অলঙ্কৃত করেছেন। মাসিক হাজার টাকা করে তিনি পান। তারপর :—

—কারমাইকেল প্রফেসার—

এই প্রফেসারসিপ ও ১৯১১ সালেই প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন ইতিহাসের জন্য এবং প্রতিষ্ঠা হয়। বার্ষিক বেতন ১২,০০০৲ টাকা। ডক্টর ডি, আর, ভাণ্ডারকার এই পদ অলঙ্কৃত করেছেন।

—আশুতোষ প্রফেসার—

ইহা ১৯২৬ সালে স্থাপিত হয়েছে। সংস্কৃতের জন্য একজন অধ্যাপক মাসিক ৮০০৲ হ'তে ১০০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হয়ে থাকেন। ডক্টর প্রভাতকুমার মুখার্জ্জী এই পদ অলঙ্কৃত করেছেন।

এ ছাড়া ঐ প্রফেসারা ইসলাম শাস্ত্রের জন্যও নির্দিষ্ট হয়েছে। অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সিদ্দিক ঐ পদ অলঙ্কৃত করেছেন।

ইতিহাস শাস্ত্রের জন্যও ৬০০৲—১০০০৲ টাকা বেতনে একজন প্রফেসার নিযুক্ত হয়ে থাকেন, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন ঐ পদ অলঙ্কৃত করেছেন।

তারপর :—

—স্যার তারকনাথ পালিত প্রফেসার—

বিগত ১৯১২ সালে স্যার তারকনাথ পালিতের ১,৫০০,০০০ লক্ষ টাকা দানের সাহায্যে এই পদের সৃষ্টি হয়। একটী পদার্থ অপরটী রসায়ন বিদ্যার জন্য। মাসিক ১০০০৲ টাকা করে মাইনে দেওয়া হচ্ছে। রসায়নের আসন সমলঙ্কৃত করেছেন জগদ্বিখ্যাত রাসায়নিক স্যার পি, সি, রায়। ফিজিক্সের আসনে ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন, বহু পূর্ব্বে ছিলেন স্যার সি, ভি, রামন।

—স্যার্ রাসবিহারী ঘোষ প্রফেসার—

স্যার্ রাসবিহারী ঘোষ গত ১৯১৩ সালে ১,০০০০,০০৲ ও ১৯১৯ সালে ১১,৪৩০০০০৲ টাকা দান করেন। এই দানের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত প্রফেসার পদগুলির সৃষ্টি হয়েছে।

[১] এপ্লায়েড্ ম্যাথ্মেটিকস্ অধ্যাপক নিযুক্ত হন ডক্টর নিখিলরঞ্জন সেন।

[২] ফিজিক্স-অধ্যাপক।

[৩] কেমিষ্ট্রী—অধ্যাপক ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র।

[৪] বোটানী—অধ্যাপক ডক্টর আগরকার।

স্যার তারকনাথ

রাসবিহারী ঘোষ

[৫] এপ্লায়েড্ কেমিষ্ট্রী—

অধ্যাপক ডক্টর হেমেন্দ্রকুমার সেন।

[৬] এপ্লায়েড্ ফিজিক্স

অধ্যাপক ডক্টর ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ।

—খয়রা প্রফেসারসিপ—

খয়রার রাজা গুরু প্রসাদ সিংহ মহাশয়ের দানে নিম্নলিখিত অধ্যাপক পদ সমূহের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক প্রফেসার মাসিক অন্যূন ৫০০৲ টাকা হিসাবে পাবেন এইরূপ স্থির হয়।

(১) রাণী বাগেশ্বরী সুকুমার-শিল্প অধ্যাপক—

অধ্যাপক ডাঃ ডক্টর সাহাদ সুরাবর্দ্দী।

(২) গুরুপ্রসাদ ভাষাতত্ত্ব-অধ্যাপক—

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(৩) গুরুপ্রসাদ পদার্থ বিত্যা-অধ্যাপক—

ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র।

(৪) গুরুপ্রসাদ রসায়ন অধ্যাপক

ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী।

(৫) গুরু প্রসাদ কৃষিবিত্যা-অধ্যাপক।

—রামতনু লাহিড়ী প্রফেসারসিপ—

৺রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থ সাহায্যে প্রথম

প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁ'রই সঞ্চিত অর্থে ৭০০—৫০—১০০০৲ টাকা মাসিক মাহিয়ানায় বাংলাভাষার এই অধ্যাপকের পদ প্রতিষ্ঠিত হয়, বর্ত্তমানে রায় খগেন্দ্র নাথ মিত্র বাহাদুর এই অধ্যাপক পদ অলঙ্কৃত করছেন

তা'রপর—

বাংলাভাষার প্রধান অধ্যাপক বার্ষিক ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা পারিশ্রামিকে-ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই আসন অলঙ্কৃত করেন।

এছাড়া আরও অনেক প্রফেসার আছেন। সকলের কথা —সব কথা বলা চলবে না। তোমরা বড় হ'লে, ভাল করে জানতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়েছে, ভাবলেও পুলকোদগম হয়। কত বিষয়ের কতই না গবেষণা হচ্ছে, কতই না আলোচনা হচ্ছে, শুধু-উন্নতি, শুধু-উন্নতি, শুধু অগ্রগতি—সত্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের মটো আজ সার্থক হয়ে উঠেছে—সত্যই এখানে হচ্ছে শুধু এড্‌ভান্সমেণ্ট্‌ অফ্‌ লার্নিং-বিদ্যার অগ্রগতি—পরমোন্নতি।

—বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক ও বৃত্তি—

সব পদক, সব বৃত্তির নাম করব না। কতকগুলো প্রধান প্রধান পদক ও বৃত্তির নাম তোমরা শুনে, জেনে রাখ।

—প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারসিপ্—

[P, R. S]

১৮৬৬ সালে সুপ্রসিদ্ধ ধনকুবের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ২,৫০০০০৲ টাকা প্রদান করেন। তা'রই নির্দ্দিষ্ট আয় হ'তে ১০০০০৲ দশ হাজার করে টাকা প্রতি বছর এম্, এ, উত্তীর্ণ একজন উৎকৃষ্ট ছাত্রকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। আজকাল বার্ষিক ২,৪০০০৲ হিসাবে ৪ জন ছাত্রকে এই বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

—কমলা লেকচারসিপ—

স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ৪০,০০০৲ টাকা দান করে এই বৃত্তি স্থাপন করে গেছেন। তাঁর মেয়ের নাম ছিল কমলা, তাঁরই নামানুসারে এ বৃত্তি স্থাপিত হ'য়েছে। লেক্‌চারার্ ১০০০৲ টাকা নগদ ও স্বর্ণপদক পা'বেন। ইংরেজী ও বাংলায় এই বক্তৃতা দিতে হ'বে। ডক্টর আনি বেসান্ট, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, ডক্টর্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিসেস্ সরোজিনী নাইডু, স্যার শিবস্বামী আয়ার, ডক্টর্ পারাঞ্জেপ ও, গঙ্গানারায়ণ ঝাঁ প্রমুখ ভারতের প্রধান প্রধান মনীষীরা এই লেক্‌চারার্ হয়েছেন।

—জগত্তারিণী পদক—

বাংলার সর্ব্বোত্তম রচনার জন্য প্রতি দু' দু' বছর অন্তর অন্তর যাঁ'রা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পান নি তাঁদের দু'শ টাকা দামের স্বর্ণ-পদক দানে পুরস্কৃত করা হ'বে এই মর্ম্মে স্যার্ আশুতোষ স্বয়ং ৩০০০৲ টাকা তাঁ'র মায়ের নামে দান করে এই পুরস্কার-পদকের ব্যবস্থা করে গেছেন। বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক এ পর্য্যন্ত এই পদক পেয়েছেন। তাঁ'দের মধ্যে বিশ্ব-কবীন্দ্র স্যার্ রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ সালে, অপরাজেয় কথা-শিল্পী স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯২৩ সালে, রসরাজ ৺অমৃতলাল বসু ১৯২৫ সালে, সর্ব্ব প্রথম মহিলা-ঔপন্যাসিকা, প্রতিভাময়ী ৺স্বর্ণকুমারী দেবী ১৯২৭ সালে, "আলো ও ছায়ার" কবি ৺কামিনী রায় ১৯২৯ সালে এবং "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ডক্টর্ ৺দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৩১ সালে, সাহিত্য-রস-সিন্ধু শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৩ সালে এই পদক পেয়েছেন। তা'রপর—

দু' দু' বছর পর পর চলছে এই পদক।

এই পদক পেতে হ'লে পদক-লাভার্থীকে "জন্মান্তর বাদ" বা "সাংখ্য ও যোগ-দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা" বিষয়ে মৌলিক রচনা প্রেরণ করতে হ'বে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত যে কেহ এই পদকের জন্য প্রতিযোগী হ'তে

পারবেন। এর বিস্তারিত বিবরণ বেরিয়েছিল—১৯৩৭ সালের ২রা সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটে।

এর রচনার বিষয় ছিল—"চতুরাশ্রমের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ" অথবা "১২০০—১৩০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালার দান"। তা'র পর এ পদকের রচনার বিষয় দেওয়া হয়েছিল :—

"প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক সাহিত্য।" অতঃপর—

রচনার বিষয় হয়—"জালালুদ্দান রুমার রচনায় হিন্দু-দর্শনের প্রভাব," অথবা—"বাঙ্গলার মুসলিম বৈষ্ণব কবি", কিংবা "মুসলিম আমলে বাঙ্গলা সাহিত্য"—বা "ভারতীয় সংস্কৃতিতে মোসলমানের দান।" ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এই সব পদক দেওয়া হয়েছে। এখনও দেওয়া হচ্ছে।

—তৃতীয় অধ্যায়—

কে বলে বাঙ্গালা দীন, হীন? বাঙ্গালা কাঙ্গাল? যাদের মধ্যে রয়েছেন এত সব জ্ঞানী, গুণী, এত সব ধনে ধনী তাঁ'রা যদি নগণ্য, তবে কোন্ দেশের কোন্ লোক বলোতো অগ্রগণ্য? বাঙ্গালীদের যাঁ'রা নিন্দা করেন তাঁ'রা হয় শুধু হিংসা করেই নিন্দা করেন, না হয়তো তাঁ'রা বাঙ্গালীর গৌরব, বাঙ্গালীর মহিমা কিছুই জ্ঞাত নহেন। আবহমানকাল—কোন দিন বাঙ্গালী হীন ছিলেন না, এখনও হীন নহেন। বাঙ্গালীর খাঁটি ইতিহাস নেই—যা' কিছু আছে, পড়ে দেখুন, বাঙ্গালীর গৌরবদীপ্তিতে চোখ ঝল্‌সে যা'বে। দেশ-প্রাণ কবি সত্যই গেয়েছেন—

"কেন গো মা তোর ধূলায় আসন,
কেন গো মা তোর মলিন বেশ?

* * * *

একদা যাঁহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়।

*　　　*　　　*　　　*

উদিল যেখানে মুরজমন্দ্রে নিমাই কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি চণ্ডিদাস গাহিল গান।
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য তুইতো না মা সেই ধন্য দেশ,
ধন্য আমরা যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্ত লেশ।

*　　　*　　　*　　　*

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ
সপ্তকোটী মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন—আমার দেশ!"

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

যে দিকে তাকাই সেই দিকে বাঙ্গালার অজস্র গৌরবে চোখ জুড়িয়ে যায়। এমন কবি, এমন সাহিত্যিক, এমন গণিতজ্ঞ, এমন ভাষাবিদ্, এমন চিকিৎসক, এমন ব্যবহারজীবী, সর্ব্বোপরি এমন ধার্ম্মিক, এমন সরল, এমন প্রতিভাদীপ্ত এমন অমায়িক, এমন অমানী, এমন মানদ জাতি আর কোথায় আছে? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অনেকে নিন্দা করেন—কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথও দুঃখ করে বলেছেন সত্য—

"সাত কোটী সন্তানের, হে মুগ্ধা জননি
রেখেছ বাঙ্গালী করে—মানুষ করনি।"

তবু আমরা বলব, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত

হয়েও বাঙ্গালীর ঘরে জন্মেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ; বাঙ্গালীর ঘরে জন্মেছেন, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, আশুতোষ, গুরুদাস, বাঙ্গালীর ঘরে জন্মেছেন, আরও কত যে মনীষী তা'র নেই ঠিক ঠিকানা! এঁরা তো সবাই এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অবদান!

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ভাইস্ চ্যান্সেলারগণের ধারাবাহিক নামোল্লেখ কালে হৃদয়ে পরমানন্দের উদয় হয়। ভাব্‌লে পুলকিত হ'তে হয় যে বাঙ্গালার অবদানেই এই বিরাট —বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বতোমুখী জয় জয়কার এনে দিয়েছে। আজ যা' কিছু এর গৌরব, যা' কিছু এর সৌরভ অধিকাংশই বহন করে বাঙ্গালীর কৃতিত্বের জাজ্বল্যমান্ নিদর্শন—কে অস্বীকার করবে এ ধ্রুব সত্য?

—ভাইস্ চ্যান্সেলারগণ—

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস হ'তে বর্ত্তমান কালাবধি যে সমুদয় মনস্বী, মহাপণ্ডিত ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারত্ব বা ভাইস্ চ্যান্সেলারের কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁ'দের পুণ্যময়, গৌরবোজ্জ্বল নাম তোমাদের কাছে বলছি :—

প্রথম ভাইস্ চ্যান্সেলার হয়েছিলেন :—

১। মাননীয় স্যার্ জেমস্ উইলিয়াম্ কোল্‌ভিল্।

২৪শে জানুয়ারী ১৮৫৭ সাল।

তিনি বিদায় গ্রহণ করলে, তাঁ'রপর হ'ন—

২। মাননীয় উইলিয়াম্ রীচি

২৫শে জানুয়ারী—১৮৫৯

তাঁ'রপর—

৩। মাননীয় ক্লভিয়াস্ জেমস্ আরস্কিন্

৮ই এপ্রিল—১৮৬২।

তাঁ'রপর—

৪। মাননীয় হেনরী সাম্‌নার মেইন্—

২৭শে মার্চ্চ ১৮৬৩।

৫। মাননীয় বিচারপতি—ডাব্লিউ, এস্, সিটন্‌কার্

২৮শে মার্চ্চ—১৮৬৭।

তাঁ'রপর—

৬। মাননীয় এফ্, সি, বেলী

২২শে এপ্রিল—১৮৬৯।

৭। মাননীয় আর্থার্ হাব্‌হাউস্—

১৮ই মার্চ্চ ১৮৭৫।

৮। মাননীয় বিচারপতি উইলিয়াম্ মার্কবি—

৩০শে মার্চ্চ—১৮৭৭

৯। মাননীয় স্যার্ আলেক্‌জাণ্ডার্ আর্বুথনট্

৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৮।

১০। মাননীয় বিচারপতি—আর্থার্, উইলসন্

১৯শে মার্চ্চ ১৮৮০।

১১। মাননীয় এইচ, জে, রেনল্ডস্

২রা ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩।

১২। মাননীয় সি, পি, ইল্‌বার্ট,

৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬।

১৩। মাননীয় ডাব্লিউ, ডাব্লিউ, হাণ্টার্—

২রা নভেম্বর ১৮৮৬।

১৪। মাননীয় স্যার্ উইলিয়াম্ কোমার্ পেথারাম্

১০ই জুন ১৮৮৭।

১৫। মাননীয় বিচারপতি স্যার্ গুরুদাস ব্যানার্জ্জী

১লা জানুয়ারী ১৮৯০।

১৬। মাননীয় বিচারপতি জোন্স্ কোয়েন্ পিগট্

১লা জানুয়ারী ১৮৯৩।

১৭। স্যার্ আলফ্রেড্ ক্রফট্—

১৯শে ডিসেম্বর ১৮৯৪।

১৮। মাননীয় বিচারপতি, ই, জে, ট্রেভেলিয়ান্

১লা জানুয়ারী ১৮৯৭।

১৯। মাননীয় স্যার্ ফ্র্যান্সিস্ উইলিয়াম্ ম্যাক্লিন্

১০ই মে—১৮৯৮।

ডাঃ সারওয়ার্দী

অধ্যক্ষ আর্কুহার্ট

২০। মাননীয় স্যার্ টমাস্ র‍্যালে
২৪শে আগষ্ট্ ১৯০০।
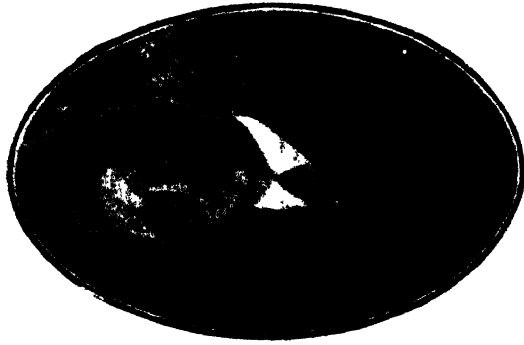
২১। স্যার্ আলেকজাণ্ডার্ পেড্‌লার
২রা এপ্রিল ১৯০৪।

২২। মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জী
৩১শে মার্চ্চ ১৯০৬।

২৩। মাননীয় স্যার্ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
৩১শে মার্চ্চ ১৯১৪।

২৪। মাননীয় স্যার্ ল্যান্সেলট্ স্যাণ্ডারসন্
৩১শে মার্চ্চ ১৯১৮।

২৫। মাননীয় ডাক্তার্ স্যার্ নীলরতন সরকার
৩১শে মার্চ্চ ১৯১৯।

২৬। মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জী
৪ঠা এপ্রিল ১৯২১।

২৭। শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্র নাথ বসু
৪ঠা এপ্রিল ১৯২৩।

২৮। মাননীয় বিচারপতি স্যার্ উইলিয়াম্ ইউয়ার্ট গ্রীভস্
৮ই আগষ্ট্ ১৯২৪।

২৯। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার

৮ই আগষ্ট, ১৯২৬।

৩০। প্রফেসার ডাব্লিউ, এস, আর্কুহার্ট

৮ই আগষ্ট, ১৯২৮।

৩১। স্যার্ হাসান সারওয়ার্দ্দী

১৯৩৩

৩২। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী

১৯৩৪

৩৩। খান বাহাদুর আজিজ-উল্ হক্

১৯৩৯।

—পঞ্চদশ ভাইস্ চ্যান্সেলার—

—স্যার্ গুরুদাস ব্যানার্জ্জী—

বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কয়জন মনস্বী ভাইস্ চ্যান্সেলারের নাম তোমরা শুনলে, তাঁ'দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম শুনেছ, বাঙ্গালী ভাইস্ চ্যান্সেলার স্যার্ গুরুদাসের নাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৫৭ সালে, সেই হ'তে ১৮৮৯ সালের ৩১ শে
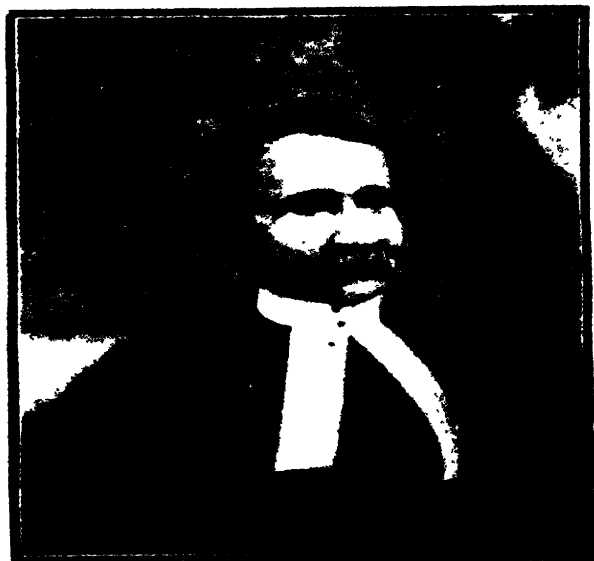
স্যার গুরুদাস

ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী এর ভাইস্ চ্যান্সেলার হন নি বা গভর্ণমেণ্ট্ হয়ত কা'কেও তেমন উপযুক্তই বোধ করেন নি। হাজার হাজার লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত এবং যথেষ্ট প্রতিভা ও প্রতিপত্তি প্রদর্শন করেছিলেন, একে একে বত্রিশ বছর চলে গিয়েছিল কিন্তু বাংলা দেশের এই বাঙ্গালীর মহা প্রতিষ্ঠানে কোন বাঙ্গালী কর্ণধার হন নি, হ'তে বুঝি পারেন নি। যে চৌদ্দ জন ভাইস্ চ্যান্সেলারের নাম এই ৩২ বত্রিশ বছরে আমরা প্রাপ্ত হই তাঁ'রা সবাই বিদেশী।

কি শুভক্ষণে কে জানে, গভর্ণমেণ্টের এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটল। তাঁ'রা বেছে নিলেন, বিচারপতি স্যার্ গুরুদাসকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী ভাইস্ চ্যান্সেলার রূপে। স্যার্ গুরুদাস ছিলেন সুপবিত্র ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত, পরম নিষ্ঠাবান্ এবং তদানীন্তন গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান বিচারালয়ের সর্ব্বপ্রধান বিচারপতি। দেশে এত লোক, এত কর্ম্মদক্ষ সুশিক্ষিত লোক থাকতেও স্যার্ গুরুদাসকেই এই শিক্ষার সর্ব্বাধিক দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার গভর্ণমেণ্ট্ কেন দিয়েছিলেন, সে কথা ভেবে দেখলেই স্যার্ গুরুদাসের অনন্যসাধারণত্ব প্রতিপন্ন হয়। গভর্ণমেণ্ট্ যে লোকচরিত্রাভিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়েছিলেন তা'তে যেমন বিস্ময়ের, তেমনই পুলক ও কৃতজ্ঞতার উদ্গম হয়। তখনকার দিনে স্যার্ গুরুদাস বাঙ্গালী মনীষীদের

মধ্যে সত্য সত্যই সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁ'র বিদ্যাবত্তার তুলনা ছিল না—তাঁ'র জ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তাঁ'র অসামান্য হিন্দুচিত নিষ্ঠা সত্য সত্যই সকলকে স্তম্ভিত ও ভক্তি-অবনত করেছিল। বাঙ্গালার ঘরে সর্ব্বতোভাবে গরিষ্ঠ তেমন সন্তান তখন আর ছিল না বললেও অত্যুক্তি হয় না।

তাঁ'র সুপবিত্র, পরমোজ্জ্বল, সর্ব্বতোভাবে আদর্শ জীবন তোমাদের জীবনে প্রতিফলিত হ'লে তোমরা সত্যিকারের মানুষ হ'য়ে উঠবে। অন্ধানুকরণ প্রবৃত্তি তোমাদের মন হ'তে বিদূরিত হয়ে তোমরা হ'য়ে উঠবে, খাঁটি—হ'য়ে উঠবে সূর্য্যের মত দেদীপ্যমান্। এমন নির্ম্মল, এমন সর্ব্বপ্রকারে অনুকরণযোগ্য চরিত্রের বাঙ্গালী—সারা বাংলা দেশ খুঁজলেও মেলা ভার।

হিন্দু ব্রাহ্মণের পরমোজ্জ্বল আদর্শ স্যার্ গুরুদাস আজ হ'তে সাতানব্বই বছর আগে বাংলা ১২৫০ সালের মাঘ মাসে—ইংরেজী ১৮৪৪ সালে কলকাতার পূর্ব্ব-দিগ্বর্ত্তী উপকণ্ঠ নারিকেল-ডাঙ্গায় এক দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

বহু দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁ'র মায়ের আশীর্ব্বাদে ও নিজের অতুলনীয়, অপরিসীম অধ্যবসায় ও মনোবল প্রভাবে কলকাতার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা-প্রতিষ্ঠান প্রেসিডেন্সী কলেজ হ'তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশেষ পরীক্ষা এম্, এ, বি, এল্ পাশ করেন। আইনে অসাধারণ কৃতিত্ব দর্শনে মুগ্ধ

হ'য়ে তখনকার বহরমপুর কলেজের বিচক্ষণ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁ'কে তাঁ'দের কলেজের আইনের অধ্যাপকরূপে বরণ করেন।

কিছুদিন অধ্যাপকতা করতে করতেই তিনি ১৮৭২ সালে কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করতে আরম্ভ করেন। তাঁ'র হিন্দু-আইন সম্পর্কে অসামান্য অভিজ্ঞতার কথা সর্ব্বজন বিদিত হয়ে উঠেছিল। গুণগ্রাহী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষও গুণের সমাদরে বিরত রইলেন না। তাঁ'রা তাঁ'কে তাঁদের সর্ব্বোচ্চ ও মহা সম্মানজনক ডি, এল্, উপাধি ভূষণে সমলঙ্কৃত করলেন।

প্রতিভা ও অভিজ্ঞতার জন্য বাইরের জনসমাজেও তাঁ'র আদরের সীমা রইল না।

১৮৮৭ সালে তিনি ছোটলাটের কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হ'লেন।

তা'র পর—১৮৮৯ সালে তিনি হাইকোর্টের মহামান্য জজ্ নিযুক্ত হন্। গভর্ণমেণ্ট তাঁ'কে এই বছরই "নাইট্" উপাধি ভূষণে বিভূষিত করেন।

পর বৎসর—তিনি সর্ব্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলে বিবেচিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁ'র এই পদ গ্রহণে বাঙ্গালীর মুখ পরমোজ্জ্বল হ'য়ে উঠল সন্দেহ নেই। কর্ত্তব্যপরায়ণতায় তাঁ'র তুলনা ছিল না।

ভাইস্ চ্যান্সেলার হয়ে—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বিরাট ও জগতের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী ভাইস্ চ্যান্সেলাররূপে তিনি অধিষ্ঠিত হ'য়ে তাঁ'র অসামান্য গুণাবলীর ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন। তাঁ'র দক্ষতায় গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মহোচ্চ সভার কার্য্য সু পরিচালিত হ'তে লাগল। সকলেই ধন্য ধন্য করতে লাগলেন।

স্যার্ গুরুদাসের বিস্তৃত জীবনী সকলেরই জানা দরকার—আশা করি তোমরা সকলেই পড়বে। পড়ে যদি নিজেরা তাঁ'র অনুকরণ করতে পার নিশ্চয় বলতে পারি, মানুষের মত মানুষ হ'য়ে উঠবে। তাঁ'র মাতৃভক্তি, তাঁ'র অশেষ কষ্টসহিষ্ণুতা, তাঁ'র দারিদ্র্যের সহিত সঙ্ঘর্ষ, তাঁ'র স্বদেশ-প্রিয়তা, তাঁ'র পরম স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা, ব্রাহ্মণোচিত মহোচ্চ হৃদয়বত্তা, সরলতা, অমায়িকতা প্রভৃতি গুণের যে কোন একটীর অনুকরণ করতে পারলেও জীবন ধন্য হ'বে। তাঁ'র আচরিত ব্যবহার পরম্পরা অনেকই গল্পের মত প্রচলিত হয়েছে। সে সব শুনলে মুগ্ধ হয়ে যা'বে। তেমন সাধু, তেমন নির্ম্মল, তেমন নিরভিমান, তেমন নিরলস জীবন তোমরা কদাচিৎ পা'বে।

আজে বাজে বই না পড়ে যদি তোমরা তাঁ'র লেখা বইগুলি পড়, কত কিছু যে জানতে পারবে, যখন পড়বে তখন তা' বুঝবে। ইংরেজীতে ও বাংলায় তাঁ'র অনেকগুলি গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ

রয়েছে। "জ্ঞান ও কর্ম্ম" তা'র মধ্যে একখানা। সময় করে পড়ে দেখো কি চমৎকার সে বই।

তাঁ'র যে পাশ্চাত্য বিদ্যায় প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল তা' হয় তো তোমাদের আর বুঝতে বাকী নেই। হাইকোর্টের জজ্ ছিলেন তিনি। রাত দিন লাট বেলাটের সঙ্গে তাঁ'র থাকতে হ'ত, সাহেবদের সঙ্গ করতে হ'ত অথচ তিনি একেবারে নিরেট, খাঁটি, ব্রাহ্মণ মানুষ ছিলেন। বাঙ্গালার আচার ব্যবহার হ'তে এক চুল এদিকে ওদিকে যেতেন না।

ব্রাহ্মণোচিত সন্ধ্যা, আহ্নিক, গঙ্গা-স্নান, পূজা-পার্ব্বণে তাঁর কদাচ বিন্দুমাত্র শৈথিল্য বা মনোযোগের ত্রুটি দেখা যায় নি। ইংরেজী ও বাংলা ভিন্ন, সংস্কৃতেও তাঁ'র প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁ'র মত ভিতরে বাইরে খাঁটি বাঙ্গালী লোককে একটা দেখা যায় না। নিজের অসামান্য তেজে তিনি সর্ব্বদা প্রদীপ্ত থাকতেন। বিশাল শাল্মলী-তরুর মত তিনি ছিলেন সরল, সুন্দর, মহিমাময়, অভ্রভেদী।

বাঙ্গালীর সৌভাগ্য ক্রমে এমন সন্তান তাঁ'দের ঘরে উপযুক্ত সময়েই তাঁ'রা পেয়েছিলেন। যত কাল বাঙ্গালী থাকবে, স্যার্ গুরুদাসের নাম লোপ পাবে না। যত কাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে, ততকাল, তা'র সংশ্লিষ্ট জনগণ কিছুতেই তা'র এই প্রথম বাঙ্গালী ভাইস্ চ্যান্সেলারকে ভুলতে পারবে

৬৪

না। তাঁ'র কৃতকর্ম্ম—তাঁর কীর্ত্তিতেই তিনি অমর হয়ে থাকবেন, সন্দেহ নেই।

শিক্ষা সম্পর্কে তিনি প্রভূত গবেষণা করে গেছেন। তাঁ'র প্রণীত গ্রন্থরাজিই তাঁ'র দেদীপ্যমান প্রমাণ, স্বদেশী যুগেও তাঁ'র দানের তুলনা নেই। তিনি সে যুগের পরিকল্পিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বতোভাবে গরিষ্ঠ পাঠ্যনির্ব্বাচন ও তাঁ'র নিয়মাবলী প্রণয়নে যে অসামান্য প্রতিভা ও নৈপুণ্যের পরিচয় এবং কষ্টসহিষ্ণুতা ও কঠোর পরিশ্রমের নিদর্শন রেখে গেছেন তা'র তুলনা মেলে না।

বাইশ বছর হ'ল তিনি চলে গেছেন। ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি ইহধাম হতে তিরোহিত হয়েছেন। তাঁ'র পাঞ্চভৌতিক দেহ না থাকলেও তাঁ'র কীর্ত্তি তাঁ'কে অমরত্ব দান করেছে। বাঙ্গালী চিরকাল তাঁ'দের গৌরবোজ্জ্বল প্রথম ভাইস্ চ্যান্সেলারের জয়গান করবে সন্দেহ নেই।

স্যার আশুতোষ

দ্বাবিংশ ভাইসচ্যান্সেলার

—স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—

বাঙ্গালা ভাইস্ চ্যান্সেলার্ স্যার্ গুরুদাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পদত্যাগ করলে একে একে ছ' ছ' জন বিদেশীয় লোক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার হ'লেন।

তা'রপর—যিনি ঐ পদ লাভ করলেন তাঁ'র কথা না জানে এমন লোক বাংলার শিক্ষিত সমাজে বিরল। ভীষ্মই যেমন মহাভারত, মহাভারতই যেমন ভীষ্ম, এই বাঙ্গালী ভাইস্-চ্যান্সেলার স্যার্ আশুতোষও তেমনই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তেমনই স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলই হচ্ছেন স্যার্ আশুতোষ।

বাঙ্গালীর ঘরে রাজা রামমোহন রায়ের পরে এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা নিয়ে বাংলাদেশে আর কেউ বুঝি জন্মেন নি। তাঁ'র জন্মে বাংলাদেশ ধন্য হয়েছে, বাঙ্গালী আজ মাথা উঁচু করে বলতে পারেন তাঁ'রা ছোট নহেন, তাঁ'রা হীন নহেন, তাঁ'রা

হেয় নহেন। বাংলার অন্যতম মহাপ্রতিভাবান্ মহামনস্বী স্যার্ রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় তাঁ'র বিশ্বভারতী গড়ে উঠছে সত্য কিন্তু স্যার্ আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যা' করে গেছেন স্যার্ রবীন্দ্রনাথ তাঁ'র বিশ্বভারতীকে তা'র তুলনায় কতদূর কি করেছেন সুধিগণ তা'র বিচার করবেন। বিশ্বভারতীর অদূর ভবিষ্যৎ ভেবে মনে কি যেন কি এক ভাব আসে।

সে কথা যা'ক্—যা' বলছিলেম, স্যার্ আশুতোষ আজ হ'তে ছিয়াত্তর বছর আগে ১২৭১ সালের ১৪ই আষাঢ় কলকাতার ভবানীপুরে জন্ম গ্রহণ করেন্। তাঁ'র পিতা ৺গঙ্গা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের পাশ করা, ভাল ডাক্তার। বেশ দু'পয়সা রোজগার করে তিনি যথেষ্ট ধন-সঞ্চয় করেছিলেন। বাইরেও যেমন ধন সঞ্চিত ছিল ভিতরেও তেমনই তিনি এমন এক ধন সঞ্চয় করেছিলেন যে সে ধনের মত ধন সারা বাংলায় আর ছিল না। সে বুঝি সাত রাজার ধন এক মাণিক। স্বামী স্ত্রীর বহু পুণ্য ফলেই সে ধন সঞ্চিত হয়েছিল, সন্দেহ নেই। আশুতোষের পিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে পুত্রকে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলবেন। সেইজন্য তিনি পুত্রের শৈশবকাল হ'তেই নিজে সর্ব্বদা তা'র পিছনে পিছনে থাকতেন। পুত্রেরও পড়াশুনার আগ্রহের অন্ত ছিল না—পিতার তো কথাই নেই—সেই জন্যই আশুতোষ এমন

বিদ্যার জাহাজ হ'তে পেরেছিলেন। আশুতোষের পিতার ইচ্ছাই ফুল ফলে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল—ফুটে উঠেছিল আশুতোষ আকারে। শুনা যায় আশুতোষ একবার তাঁ'র বাবার নিকট একখানা ভূগোল আর পৃথিবীর মানচিত্র চেয়েছিলেন। তাঁ'র বাবা কি করেছিলেন শুনলে তোমরা হাসবে। তিনি পুত্রের শিক্ষার জন্য সে সময়ে যতগুলি ভূগোল ও যতগুলি পৃথিবীর মানচিত্র বাজারে প্রচলিত ছিল সবগুলিই কিনে এনে তাঁ'র হাতে দিয়েছিলেন। লোকের ছেলেকে ধরে বেঁধে পড়ানো যায় না, আর আশুতোষের শৈশবে পড়বার ইচ্ছা এত বেশী ছিল যে একদিন তাঁ'র বাবা এত বেশী পড়লে তাঁ'র স্বাস্থ্য হানি হ'বে আশঙ্কায় তাঁ'কে এক ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলেন, কিন্তু এক ঘণ্টা পরে দরজা খুলে দেখে আশ্চর্য্য হলেন যে বই না পেয়ে আশুতোষ কয়লা দিয়েই সেই ঘরের মেজেতে জ্যামিতির প্রব্লেম্ কষছেন। ঘর একেবারে জ্যামিতির এঙ্গল ট্র্যাঙ্গলের ছবিতে ভরে উঠছে। আশুতোষ যেবার এম্, এ দেন সেইবারই এম্, এর পরীক্ষকও হন। এ কি যে সে কথা! পাঠ্যাবস্থায়ই তিনি এত পড়ে ফেলেছিলেন যে তাঁ'র শিক্ষকগণ তাঁ'কে তাঁ'দের সমকক্ষই মনে করতেন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের "আশুতোষের ছাত্রজীবন" পড়লে তোমরা এ সব অনেক কিছু জানতে পারবে।

আশুতোষ পঁচিশ বছর বয়সেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে একচ্ছত্র প্রভুত্ব লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত পরীক্ষাগারকে কি করে যে তিনি এমন মহাশিক্ষাগারে পরিণত করেছিলেন তা' ভাবলে বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত হ'তে হয়। এত বড় একটা বৃহৎ ও মহৎ কার্য্যে তাঁ'র কল্পনা শক্তির সঙ্গে সঙ্গে গঠন-শক্তি ও কর্ম্মকুশলতার যে অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায় সেরূপ আর কোন বাঙ্গালী কেন কোন ভারতবাসীর মধ্যেও কোন কালে দেখা যায় নি। তিনি বত্রিশ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ডক্টর অফ্ ফিলসফী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডক্টর আশুতোষ নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হন। ১৯০২ সালে লর্ড কার্জ্জনের মত জাঁদরেল লোকও তাঁ'কে ভারতীয় ইউনিভারসিটী কমিশনের সদস্য নির্ব্বাচিত করেন। তা'রপর ১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যে "স্যাডলার কমিশন্" বসে তা'তেও তিনি বিশিষ্ট সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

হাইকোর্টে প্রতিপত্তির সঙ্গে ওকালতী করতে করতেই তিনি জজ্ হন, সে হচ্ছে ১৯০৪ সালের কথা। ১৯০৬ হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি দু'বার করে চার বার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। তা'র পর আবার ১৯২১ হ'তে ১৯২৩ পর্য্যন্ত পঞ্চমবার ভাইস্-চ্যান্সেলার হন।

আশুতোষ এ ছাড়া আরও কত কি যে করে গেছেন, তা'

পড়লে তোমরা অবাক্ হয়ে যা'বে। মানুষ বুঝি তা' পারে না—মনে হয় বুঝি কোন ঐন্দ্রজালিক বা দৈব শক্তিতে তিনি শক্তিমান্ ছিলেন। আশুতোষ তাঁর জীবনে তিন তিন বার এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সভাপতি হন। তিনবার এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সভাপতি হওয়া এ দেশে আর কা'রও ভাগ্যে ঘটেনি। ১৯০৯ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়ামের প্রেসিডেণ্টও হয়েছিলেন। তিনি প্রায় জীবনের শেষাংশ অবধি হাইকোর্টের জজ্ ছিলেন। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে অবসর গ্রহণ করেন ও বিহারের ডুমরাওনের মহারাজার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁর এক মামলা চালা'বার জন্য পাটনা হাইকোর্টে ওকালতী করতে যান। মোকদ্দমা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, এমন সময় সহসা দু'দিনের অসুখে ১৯৩১ সালেরই ১১ই জ্যৈষ্ঠ তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন।

১২৯৩ সালে ২২ বৎসর বয়সে তিনি কৃষ্ণনগরের অধ্যাপক রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর ৪ ছেলে ও ৩ কন্যা ছিল। বড় মেয়ে কমলাকে তিনি বড় ভালবাসতেন। তিনি তাঁ'কে বিধবা বিয়ে দিয়েছিলেন। সে কমলা দেবী নেই—তাঁ'রই স্মৃতির উদ্দেশ্যে কমলা লেক্চারের বৃত্তি-স্থাপনের কথা তো আগেই বলেছি।

পোষাক পরিচ্ছদে, চাল চলনে, রীতি নীতিতে ও ধর্ম্মে তিনি

হিন্দুর আচার নিয়ম মানতেন কিন্তু গোড়া ছিলেন না। এত কায, এত সব গোলযোগের মধ্যেও খাঁটি ব্রাহ্মণের মত তিনি সন্ধ্যা, আহ্নিক, পূজাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম যথাবিধি করতেন। যে সব চাকরীয়াদের সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় হয় না বলে অজুহাত আজ কাল অনেকের মুখে শুনা যায়, তাঁরা আশুতোষের ন্যায় কর্ম্মব্যস্ত লোকের, এই প্রগাঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখে অনেক কিছু শিখতে পারেন; তাঁর ন্যায় কর্ম্মব্যস্ত ক'জন আছেন? অত শত দায়িত্বপূর্ণ, জটিল কায ক' জনে করে থাকেন? আশুতোষের এ সব দুর্ব্বলতা মোটেই ছিল না—বাড়ীর দুর্গোৎসবের চণ্ডীপাঠ করতেও তাঁকে বহুবার দেখা গেছে। এ সব বিষয়ে তাঁ'র বিন্দুমাত্র শৈথিল্য বা আলস্য ছিলনা। পীড়িত, আশ্রিত, বিপন্ন, দরিদ্রকে সাহায্য করা তাঁ'র চিরদিনকার অভ্যাস ছিল। বড় ছোট সবার সঙ্গেই তিনি সমভাবে মিশতেন, আলাপ আলোচনা করতেন।

চারদিককার সব কায নির্ব্বাহ করে, জটিল ও কুটিল আইন ব্যবসায়ের মধ্যে লিপ্ত থেকে, শ্রেষ্ঠ বিচারপতি রূপে ভারতের শ্রেষ্ঠ বিচারালয়ে সুদীর্ঘকাল সমভাবে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে ও আইনের নতুন নতুন বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করে তিনি সত্য সত্যই—সকলকে একান্ত বিস্মিত করে গেছেন। ভাবতেও পারা যায় না যে একটী লোকে এত সব কেমন করে করতে

পারে। বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে সরকারী প্রভুত্ব হ্রাস করতে তাঁ'কে যে কি অলৌকিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল, অনেকেরই সে সব ধারণা করাও কঠিন। এতে যে তাঁকে কত বেগ পেতে হয়েছে, তাঁ'কে যে কত লোকের নিন্দা ভাজন হ'তে হয়েছে, কত রাত যে তিনি দুশ্চিন্তায় না ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন সে সব বলবার নয়। তাঁ'র নিজের জন্য এ সবের কিছু মাত্র প্রয়োজন ছিল না, তোমাদের ও আমাদের জন্যই তিনি এ সব করে গেছেন। আমরা যদি তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন না করি, কৃতজ্ঞতা না দেখাই, তা' হ'লে নিশ্চয়ই আমাদের মহা পাপ হ'বে সন্দেহ নেই। কৃতঘ্নের মত পাপী নেই।

আট বছর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিভাগে, সব ব্যাপারে তিনি নিজে হস্তক্ষেপ করেছেন আর শুধু হস্তক্ষেপ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, একচ্ছত্র প্রভুত্বও লাভ করে গেছেন। আশুতোষের সময়ে—বিশ বছর কাল, একদিন, দু'দিন নয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বল্লে আশুতোষকেই বুঝাত। এমন একচেটে কর্তৃত্ব খুব কম লোকেই করতে পারেন। ফাঁকে ফাঁকে অন্য ভাইস্ চ্যান্সেলার নিযুক্ত হ'লেও তাঁর পরামর্শ ভিন্ন কোন কর্ম্ম কেউ করতে সাহসী হন নি। বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি প্রাণের চেয়েও ভালবাসতেন। তা'র নিন্দা ও তা'র শিক্ষাপদ্ধতির

দোষ কেউ কীর্ত্তন করলে তিনি যত বড় লোকই হউন না কেন আশুতোষ তাঁ'কে ছেড়ে কথা কইতেন না—প্রাণপণে প্রতিবাদ করতেন।

ভারতের জাঁদরেল্ বড় লাট লর্ড কার্জ্জন সব বিষয়েই হাত দিয়াছিলেন, সবই ভেঙ্গে চুরে, ভাল ও মন্দ করে দিয়ে গেছেন। তিনিও যখন "বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারক" আইন করে দেশের উচ্চ শিক্ষার পথ সঙ্কুচিত করতে উদ্যত হয়েছিলেন তখন আশুতোষই বুদ্ধিকৌশলে তাঁ'র সে চেষ্টা ব্যর্থ করেছিলেন। লর্ড কার্জ্জনের ইচ্ছা ছিল যে এদেশবাসার উচ্চ শিক্ষার দ্বার তিনি রোধ করবেন, কিন্তু আশুতোষেরই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, তেজস্বিতা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাঁ'র সেই অসদুদ্দেশ্য একেবারে নিস্ফল হয়েছিল এবং তাঁরই চেষ্টাতেই উচ্চ শিক্ষার পথ নিতান্ত 'সুগম হয়ে উঠেছে। তাঁ'রই অক্লান্ত চেষ্টায় আজ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এত বি,এ, এম্, এ,। বঙ্গভাষায় পরীক্ষা বাধ্যতামূলক ও পাশের জন্য অবাধ ব্যবস্থা করে এবং প্রকৃত শিক্ষার জন্য পোষ্ট্ গ্র্যাজুয়েট্ ক্লাস খুলে তিনি বাংলার শিক্ষা জগতে যুগান্তর এনে দিয়েছেন।

অভাব না হ'লে কবে কোন্ জাতি বড় হয়েছে, এই ছিল আশুতোষের ধারণা। ঘরে ঘরে শিক্ষিতলোকগণ হাহাকার করুন্ তা'হ'লেই দেশে জাগরণের সাড়া পড়বে এই ছিল তাঁর

কল্পনা। অনেক লাঞ্ছনা, অনেক সমালোচনা তাঁকে সইতে হয়েছে কিন্তু কিছুতেই তিনি তাঁর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হন নি। বীরের মত সব অকাতরে সহ্য করে গেছেন।

তাঁর বড় দু'টী কাযের কথা তেমন করে এতক্ষণ তোমাদের বলা হয় নি। একটী হচ্ছে, সায়ান্স্ কলেজ স্থাপন, অপরটী বঙ্গভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের অবশ্য পাঠ্য বিষয় রূপে নির্দ্দেশ।

"নানান দেশের নানান ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা ?"

এই ছিল তাঁর মনের কথা।

সায়ান্স কলেজের টাকা যে তিনি কত কষ্টে সংগ্রহ করেছিলেন, তা' আর বলবার নয়। অবশেষে তাঁরই প্ররোচনাতেই স্যার্ তারকনাথ ও স্যার্ রাসবিহারী যে অত অর্থ দান করেছিলেন সে কথা হয়তো না বললেও চলে। রাসবিহারী দিয়ে গেছেন আঠার লাখ টাকার সম্পত্তি—তারকনাথ দিয়ে গেছেন প্রায় পনর লাখ। তা'রপর—বাংলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য পাঠ্য বিষয় করতে গিয়েও তাঁকে অনেক কিছু করতে হয়েছিল। সে সব বিপর্য্যয় সহ্য করা এক আশুতোষ ভিন্ন অপরের পক্ষে হয়তো সম্ভবই নয়। কিন্তু নাছোড়-বান্দা তিনি—শেষ পর্য্যন্ত তাঁরই জয় হয়েছে। তিনিই বাংলা ভাষায়

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে গেছেন।

তাঁ'রই অক্লান্ত চেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁ'রই আকাঙ্ক্ষায় পৃথিবীর নানা দেশের বিদ্বানগণ জ্ঞাতব্য আহরণের জন্য মধুলোলুপ মক্ষিকার ন্যায় আজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করছেন। তাঁ'রই চেষ্টায় নানা স্থানের নানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, দুর্লভ গবেষণার সামগ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে আহৃত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় তিনি বাঙ্গালার সাদা সিধে পোষাক ধুতি, চাদর পরেই লাট বেলাটের সঙ্গে দেখা করতেন।

আশুতোষের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় প্রদানের চেষ্টা বৃথা। তিনি যে সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সে সকলের উল্লেখও এই ক্ষুদ্র পরিসর স্থানে অসম্ভব। একমাত্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ভিন্ন আর কারও তিরোধানে তাঁ'র মত সমগ্র ভারতের লোক শোকাচ্ছন্ন হন নি। পাটনা হ'তে তাঁ'র দেহ কলকাতায় আনা হয়। মহাসমারোহের সহিত শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়।

তাঁ'কে ভোলা দায়। শিক্ষিত কেহই অন্ততঃ ভুলতে পারবেন না।

তবু তাঁ'র কথা পুনঃপুনঃ স্মরণ-পথবর্ত্তী রাখার জন্য কলকাতার রসারোড্ নামক বিস্তৃত রাজপথটীর নাম স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড্ রাখা হয়েছে। ধর্ম্মতলার নিকট—ইলেকট্রিক্ অফিস্ ও ষ্টেট্সম্যান্ অফিসের মধ্য স্থানে তাঁ'র একটী পূর্ণাঙ্গ ব্রোঞ্জ্ প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বাড়ীটি যে "আশুতোষ বিল্ডিং" নামে অভিহিত হয়েছে, তা'ত আগেই বলেছি। ভবানীপুরের হাজরা পার্কে আশুতোষ কলেজ ও স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হয়েছে। দ্বারভাঙ্গা বিলডিংস্থিত তাঁ'র মর্ম্মর মূর্ত্তি তাঁ'কে স্মরণে এনে দেয়।

যতদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ থাকবেন ততদিন তিনি অমর হ'য়ে তাঁ'দের হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

তাঁ'র গুণের সমাদর তাঁ'র জীবদ্দশাতেই যথেষ্ট হয়েছিল। তাঁ'র উপাধির অন্ত ছিল না। তাঁ'র পূর্ণনাম পড়তে বহুক্ষণ লাগে। নামটী দাঁড়িয়েছিল এইরূপ :—

অনারেবল্ জাষ্টিস্ স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কে, টি, এম্, এ, পি, আর্, এস্, ডি, এল্, ডি, এস্-সি, পি-এইচ্, ডি, এফ্, আর, এ, এস্, এফ্, আর্, এস্, ই, সি, আই, ই, ডি, লিট্, সি, এস্, আই, সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি, বর্ণী-বিনোদ, বিক্রমাদিত্য, সম্বুদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী।

বাংলার ও বাঙ্গালীর উজ্জ্বলতম রত্ন, বাণীর বরপুত্র স্যার্ আশুতোষের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কিরূপ অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল তাঁ'র একটা ক্ষীণ ও অতি সংক্ষিপ্ত আলেখ্য তোমাদের সামনে উপস্থিত করলেম মাত্র।

বাংলা দেশে তাঁ'র ন্যায় মেধাবী, তাঁর ন্যায় প্রতিভাবান্ ছাত্র অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করেছে। তাঁরই অক্লান্ত সাধনার ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অন্যতম বলে পরিগণিত হয়েছে এ কথা সবাইকে পুনঃপুনঃ স্বীকার করতেই হ'বে।

তিনি মনে. প্রাণে, আহারে, পরিচ্ছদে সর্ব্বাংশে একজন আদর্শ বাঙ্গালা ও হিন্দু ছিলেন। বাংলায় কেমন করে এই শার্দ্দুল, এই বাঘের জন্ম হয়েছিল ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। তাঁ'র মধ্যম পুত্র শ্যামাপ্রসাদও ভাইস্ চ্যান্সেলার্ হ'য়ে পিতার উদ্দিষ্ট সাধন করেছেন। যিনি দেশের ও দশের শিক্ষা ও জ্ঞানোন্নতির জন্য আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁকে বাঙ্গালী যে কখনও ভুলতে পারবে না এ নিশ্চিত।

—:(*):—

স্যার দেবপ্রসাদ

৮ ভূপেন্দ্রনাথ বসু

ত্রয়োবিংশ ভাইস্‌চ্যান্সেলার

—স্যার্‌ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—

স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌ চ্যান্সেলার পদ হ'তে অবসর গ্রহণ করলেই ১৯১৪ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে স্যার্‌ দেবপ্রসাদ ভাইস্‌ চ্যান্সেলার পদে বৃত হন। স্যার্‌ দেবপ্রসাদেরও গুণ গরিমার অবধি ছিল না।

তিনি কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ এলোপ্যাথী চিকিৎসক স্বর্গীয় রায় বাহাদুর সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র ও স্বর্গীয় প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

হাওড়া জেলার বামনপাড়া গ্রামে তিনি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ৭ই তারিখ জন্মগ্রহণ করেন। সে ছিল বাংলা ১২৬৭ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার। রামেশ্বরপুরের মাইনর স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করে তিনি ডাফ্‌ স্কলারসিপ্‌, গোবিন্দপ্রসাদ স্কলারসিপ্‌ ও নানা সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি লাভ করতে করতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ঐ বৎসরই তিনি বি, এল্‌ পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হ'য়ে এটর্ণী অফিসে প্রবেশ করেন, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এটর্ণী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাঁর কলকাতার বাসার ঠিকানা ছিল ২০নং সুরা লেন্।

তারপর—১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল্ সভায় ও ইম্পিরিয়াল্ লাইব্রেরী কমিটীর অন্যতম সদস্য রূপে নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফেলো" নির্ব্বাচিত হন। ক্রমশঃ ফ্যাকাল্টি ও সিণ্ডিকেটের সভ্যও নিযুক্ত হন।

ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্, ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্ ও ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট্, ন্যাশন্যাল কংগ্রেস ও সাহিত্য পরিষদ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হয়ে তিনি ২য় বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবিষ্ট হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হ'তে তিনি "লণ্ডন্ ইউনিভার্সিটিস্ অফ্ দি এম্পায়ার" কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

সপত্নীক সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ যখন কলকাতায় আসেন তখন তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য ছাত্রদের শোভা যাত্রার ভার স্যার্ দেবপ্রসাদই গ্রহণ করেন এবং এ বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় তাঁদের এখানে অবস্থান কালেই রাজসন্তোষের নিদর্শন

স্বরূপ সম্রাট দম্পতী তাঁদের স্বাক্ষরযুক্ত দু'খানা ফটোগ্রাফ্ পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন, [১৯১২। ৭ই জানুয়ারী]

তা'র পর বছর বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মহামিলনোপলক্ষে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে ইংলণ্ডে গমন করেন এবং সেখানে তদুপলক্ষে এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে সম্মানসূচক এল্, এল্, ডি, উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে দেবপ্রসাদ ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক, সি, আই,-ই উপাধি ভূষণে ভূষিত হন। মার্চ্চ মাসেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী সভাপতি বা ভাইস্ চ্যান্সেলার পদে বৃত হন। অতঃপর তিনি নাইট্ হন। সি, বি, ই, এল্, এল্ ডি, সূরীরত্ন, বিদ্যারত্নাকর, বঙ্গরত্ন, জ্ঞান সিন্ধু প্রভৃতি বহু সম্মানজনক মহোচ্চ উপাধি লাভ করেন। গুণগ্রাহী গভর্ণমেণ্টও তাঁকে স্যার উপাধি ভূষণে সমলঙ্কৃত করতে কার্পণ্য করেন নি।

বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় সমভাবে তিনি অতি সুন্দর বক্তৃতা করতে পারতেন। 'একাদিক্রমে ১৯২৭-১৩৪২ পর্য্যন্ত গীতা সভার সভাপতি ছিলেন।

বিগত ১৯৩৫—১০ই আগষ্ট্ শনিবার, বাংলা ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৪২, রাত্রি ৩টায় ইহধাম ত্যাগ করেছেন। তিনি বহু প্রতিষ্ঠানেরই সুযোগ্য কর্ণধার ছিলেন—কলকাতা বউবাজারের

সন্নিহিত চুনাপুকুর লেনের বিখ্যাত গীতা সভার অভ্যন্তরভাগে প্রতিষ্ঠিত তাঁর তৈল-চিত্র তাঁর ভক্তিস্মৃতি চিরকাল বহন করবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চবিংশ সহকারী সভাপতি বা ভাইস্‌চ্যান্সেলার

—ডাক্তার স্যার্ নীলরতন সরকার—

স্যার নীলরতন সরকার কলকাতার শ্রেষ্ঠ এলোপ্যাথী ডাক্তার। ডাক্তার হিসাবে তাঁর যশের—খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সীমা নেই। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন. এম্, ডি, উপাধিধারী।

বাংলা কাউন্সিলের মেম্বার এবং বহুবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও স্বদেশী শিল্পের ব্যবসায়ের সহিত আজীবন ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। বিগত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে গুণগ্রাহী গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার পদে বৃত হন।

তাঁর সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের তেমন উল্লেখযোগ্য উন্নতির কথা জ্ঞাত হওয়া যায় না। গভর্ণমেণ্ট্ তাঁর বহুবিধ গুণে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে বহু সম্মানজনক "স্যার্" উপাধি দ্বারা সমলঙ্কৃত করেছেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তিনি এখনও আমাদের মধ্যেই আছেন। দিন দিন তাঁ'র চিকিৎসা-নৈপুণ্যে দেশ বিদেশের বহু হতাশ রোগী ও রোগিনী তাঁ'র অশেষ যশঃ ঘোষণা করছেন। তাঁ'র এই সব স্ব-কীর্ত্তিতেই তিনি অমর হয়ে থাকবেন সন্দেহ নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে শীঘ্রই ডি, এস্-সি উপাধি দেবেন বলে প্রস্তাব চলছে।

--:(●):—

বিশ্ববিদ্যালয়ের
সপ্তবিংশ ভাইসচ্যান্সেলার
—ভূপেন্দ্র নাথ বসু—

স্বর্গীয় স্বদেশ-প্রাণ, দেশ-নেতা ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কলকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ছিলেন।

হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরের মুখ্য কুলীন কায়স্থ বসু বংশের সন্তান ইনি।

কলকাতায় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজ হ'তে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এটর্ণী পরীক্ষার শিক্ষানবিশীতে প্রবৃত্ত হন।

তা'রপর ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে ইনি এম, এ পরীক্ষায়ও সমুত্তীর্ণ হন। এটর্ণী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং খুব অল্প সময়েই অসামান্য সাফল্য লাভ করেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা হিতকর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে দেশবিখ্যাত হয়ে উঠেন।

কলকাতা কার্পোরেশনের কমিশনার ও চেয়ারম্যানরূপে কিছু দিন কার্য্য করেন ও স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কর্পোরেশন ত্যাগ করেন। ময়মনসিংহের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের সভাপতি

ও তৎপর ১৯১১ সালের কলকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিত্বও করেন।

অতঃপর—১৯১৪ সালে মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রেসিডেণ্ট্ হন।

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে যোগ দিয়ে দেশের অনেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভারও সভ্য নির্ব্বাচিত হন। তিন তিনবার ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবেশ লাভ করে ১৯০৭ সালে ভারত-সচিবের মন্ত্রণা-সভার বে-সরকারী সদস্যরূপে মনোনীত হয়ে বিলাত যান ও সহকারী ভারত-সচিবের পদ লাভ করেন। ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেবের শাসন-সংস্কার আইন প্রণয়নে ইনি তাঁর যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৯২২ সালে ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে জেনেভার জাতি-সঙ্ঘের বৈঠকে গমন করেন। তারপর রয়্যাল কমিশনের সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের কার্য্য ত্যাগ করে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য হন ও সেই সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলারের বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করেন। গুরু পরিশ্রমে—১৯২৪ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর এই মনস্বী মহাপুরুষের তিরোভাব ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের

ঊনত্রিংশ ভাইস্‌চ্যান্সেলার

—শ্রীযুত যদুনাথ সরকার—

রাজসাহীর গণ্ডপল্লী করচমাড়িয়া গ্রামের জমিদার স্বর্গীয় রাজকুমার সরকারের এই মনস্বী পুত্র স্বায় অসামান্য প্রতিভায় ভুবনোজ্জ্বল করেছেন। ইনি শুধু বাংলাদেশ ও বাঙ্গালার গৌরব নহেন! সত্তর বছর আগে ১৮৭০ সালের ১০ই ডিসেম্বর এঁর জন্ম হয়। স্থানীয় রাজসাহী কলেজে অধ্যয়নান্তে ইনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করে অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। সকল পরীক্ষাতেই ইনি প্রথম শ্রেণীর স্কলারসিপ্‌ বা বৃত্তি পেয়েছিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে যখন অধ্যাপক সরকার এম্‌, এ পরীক্ষা দেন তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৮৯৭ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন এবং ১৮৯৮ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজ হ'তে তিনি পাটনা কলেজে বদলী হন। সেখানে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করেন, মধ্যে কিছুদিন

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯১৭—১৯) ইউনিভারসিটী প্রফেসার অফ্ ইণ্ডিয়ান্ হিষ্টোরী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

অতঃপর ১৯১৯ হ'তে ১৯২৩ পর্য্যন্ত কটক কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯২৬ সালে তিনি গভর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক সি, আই, ই উপাধি ভূষণেও ভূষিত হয়েছেন।

ইহার পূর্ব্বেই ১৯২৩ সালে বিলাতের রয়াল্ এসিয়াটিক্ সোসাইটী তাঁকে তাঁদের "সম্মানিত সদস্যের" পদে মনোনীত করেন। এ সোসাইটীর মর্য্যাদা অসামান্য। পৃথিবীর মাত্র ৩০ জন বিখ্যাত ব্যক্তিকে এঁরা এঁদের সদস্য শ্রেণীভুক্ত করে থাকেন। বাঙ্গালী অধ্যাপক যদুনাথ সেই ত্রিশ জনের একজন হয়েছিলেন।

"জেমস্ ক্যাম্বেল" নামে বোম্বাই এসিয়াটিক্ সোসাইটীর যে বিখ্যাত সুবর্ণ-পদক পুরস্কার দেওয়া হ'ত অধ্যাপক সরকার নিজগুণে সেই পদক লাভ করে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে মৌয়্যাট্ গোলড্ মেডেল এবং গ্রাফিথ্ রিসার্চ্চ প্রাইজ্ দান করে সম্মানিত করেছিলেন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট্ তারিখে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার পদ লাভ করেন। অধ্যাপকের

এই পদ লাভ অধ্যাপক সরকারের ভাগ্যেই প্রথম ঘটেছিল। ইংরেজীর এম, এ হ'লেও অধ্যাপক সরকারের জগদ্বিখ্যাত নাম হচ্ছে ঐতিহাসিক বলে। ইতিহাসে তাঁ'র অসাধারণ অধিকার আজ জগৎ স্তম্ভিত করেছে। তাঁ'র প্রণীত গ্রন্থে একখানি লাইব্রেরী হ'তে পারে।

ভারতের মোগল-শাসন ও শিবাজী সম্বন্ধে তিনি প্রভূত পরিমাণে অনুসন্ধান ও গবেষণা করেছেন, তাঁ'র মৌলিক গবেষণায় বিশিষ্ট প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকগণও চমৎকৃত হয়েছেন। মূল পারসী ও উর্দ্দু প্রাচান প্রাচীন বহু গ্রন্থ হ'তে তিনি উপকরণসমূহ সংগ্রহ করে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস পাঁচখণ্ড ও শিবাজী মহারাজের জীবনী প্রণয়ন করেছেন। তাঁ'র গ্রন্থরাজি ভুবনবিখ্যাত ও বিজ্ঞানানুমোদিত প্রণালীতে ঐতিহাসিক গবেষণার চরম নিদর্শনরূপে বিরাজ করছে।

অধ্যাপক রমন্

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী

বিশ্ববিদ্যালয়ের

একত্রিংশ ভাইস-চ্যান্সেলার

—শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট স্কুল ও কলেজে যাঁ'রা পাঠ করেন কিংবা বাংলা দেশে যাঁ'রা বাস করেন ও সংবাদপত্রাদি পড়েন, তাঁ'দের নিকট হয়তো এই স্বনামধন্য মহাপুরুষের বিশেষ পরিচয় না দিলেও চলবে। এঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় এঁর পিতা ভুবনবিখ্যাত স্যার্ আশুতোষের আরব্ধ ও পরিকল্পিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উন্নতিবিধায়ক কর্ম্মগুলির সুষ্ঠু পরিসমাপ্তি ঘটেছে। পিতা যা' যা' শেষ করে যেতে পারেন নি ইনি সে সকলের প্রায় সমাপ্তি এনে দিয়েছেন। হিন্দীতে একটা কথা আছে—"বাপ্ কা বেটা"—সেই কথাটার চরম নিদর্শন আমরা শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদের কৃত কর্ম্মাবলীতে দেদীপ্যমান্ দেখতে পাচ্ছি। শ্যামাপ্রসাদ সত্যই বাঙ্গালার সৌভাগ্যক্রমে তাঁ'দের শ্যামা মায়ের প্রসাদ স্বরূপই অবতীর্ণ হয়েছেন।

স্যার্ আশুতোষের সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল সংস্কার

সংসাধিত হয়েছে, তা'র মধ্যে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক করাই প্রধান। স্যার্ আশুতোষের আমলে উহা শুধু প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাধ্যতামূলক হয়নি, তাঁ'র প্রবর্ত্তিত আই, এ এবং বি, এ পরীক্ষাতেও উহা বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে, তা'র পর শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশেষ পরীক্ষা এম্, এতেও উহা গৃহীত হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ইংরেজী, সংস্কৃত, আরবী, পারশী প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে সমমর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়।

স্যার্ আশুতোষের চেষ্টায় এ সব আরম্ভ হয়েছিল মাত্র কিন্তু তাঁ'র এই পুত্র তা'র বহুদূর উন্নতি সাধন করেছেন।

কলেজে কলেজে গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয় ইংরেজী ভাষার সাহায্যেই অধ্যাপিত হ'ত। বাংলা ভাষায় ঐ সকল বিষয়ের অ[illegible]পনা হ'ত না বলেই ঐ সকল বিষয়ে উচ্চাঙ্গের কোন গ্রন্থ বাংলায় প্রণীত হয়নি। অনেক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পরিভাষার প্রতিশব্দও সৃষ্ট হয়নি। পিতার পদাঙ্কানুবর্ত্তী [illegible]মাপ্রাসাদের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় এদিকেও মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং যা'তে বাংলা ভাষাতেই সকল বিষয়ের অধ্যাপনা হয় এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপযোগী পরিভাষার সৃষ্টি হয় তা'র ব্যবস্থা হয়েছে। স্যার্ আশুতোষের আমলেই প্রথমে কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক চিকিৎসকগণ নিয়োজিত

হয়েছিলেন। এখন বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রায় সকল কলেজেরই কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের শারীরিক উন্নতির নিমিত্ত নানাবিধ শ্রমজনক ও শক্তিসাধ্য ক্রীড়ার প্রবর্তন করেছেন। যুবক যুবতীগণকে কর্ম্মজীবনে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলবার জন্য বিদ্যালয়ে কাযাকরা শিক্ষা দেবার চেষ্টা চলছে এ চেষ্টায়ও শ্যামাপ্রসাদের মঙ্গল হস্ত যথেষ্ট পরিমাণে প্রযোজিত হয়েছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স আটাত্তর বৎসর হ'য়ে গেলেও বিস্ময়ের বিষয় এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তা'র জন্মদিন উপলক্ষে কোন উৎসবাদিরই অনুষ্ঠান হয় নি। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভাইসচ্যান্সেলার পদ গ্রহণ করেই এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। বিগত ১৯৩৫ সালের ২৪ শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার সর্ব্বপ্রথম এর জন্ম-বার্ষিকী উৎসব আরম্ভ হয়। সেদিন কলকাতার বিভিন্ন কলেজের প্রায় পাঁচ'শ ছাত্র ছাত্রী অত্যন্ত ধূমধামের সহিত ব্যাণ্ড বাজিয়ে, মার্চ্চ করে গড়ের মাঠে সমবেত হন। সেখানে গভর্ণর সাহেবের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা অভিবাদন করা হয়।

তা'র পর এই প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলাররূপে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তা'র মর্ম্ম এইরূপ:—

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আমরা আজ পুনরায়

সমবেত হয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শুভার্থী বন্ধুগণ এবং অন্যান্য যাঁ'রা বিশ্ববিদ্যালয়কে নানাভাবে সাহায্য করে আসছেন, তাঁ'দের বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হ'তে আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন কল্পে আমরা ক্রমশঃ উহার পরিবর্ত্তন সাধন করছি কতকগুলি নতুন প্রচেষ্টায়, —ফল কতদূর পর্য্যন্ত হ'তে পারে কে জানে! অর্থাভাবই আমাদের সর্ব্বপ্রধান অভাব, কিন্তু সেজন্য এই প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা না করে আমরা নিশ্চেষ্ট ভাবে বসে থাকতে পারিনে। উহার জন্য আমাদিগকে সমবেতভাবে চেষ্টা করতেই হ'বে।

—সামরিক শিক্ষা—

শিক্ষা-বিস্তার ও জাতির শিক্ষিত সমাজের শক্তি বৃদ্ধি করা যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য, তেমনই ছাত্র-সমাজের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখাও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ। বিভিন্ন কলেজে কর্ম্ম প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধনের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমাগত চেষ্টা করে আসছে, সম্প্রতি ছাত্রগণকে সামরিক শিক্ষা দেবার প্রস্তাব হয়েছে। যদিও এই শিক্ষা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ থাকবে তা' হ'লেও এতে জাতির জীবন ও চরিত্র গঠনে যথেষ্ট সাহায্য হ'তে পারে। এরূপ আশা করা হয়তো অন্যায় নয় যে, অদূর ভবিষ্যতে

আমাদের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হ'বে এবং যুবকগণকে সামরিক শিক্ষাদানের জন্য বাংলায় একটী পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠানই গড়ে উঠবে।

—হিতসাধন ব্যবস্থা—

"ষ্টুডেণ্টস্ ওয়েলফেয়ার্ ডিপার্টমেণ্ট্" বা ছাত্র-মঙ্গল বিভাগ সুচারুরূপে তাঁ'দের কর্ত্তব্য সম্পাদন করছেন। আমরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যে কেবলমাত্র ছাত্র সমাজের হিতসাধনের জন্য একটী পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাই। এই প্রদেশের নানাস্থানে এর শাখা থাকবে এবং সমস্ত স্কুল ও কলেজের সহযোগিতায় এই চেষ্টা সফল করে তুলতে হ'বে।

স্কুল ও কলেজ হ'তে বের হ'বার পর ছাত্রগণের প্রতি দৃষ্টি রাখবার জন্য কতকগুলি কেন্দ্র স্থাপন করতে হ'বে। চিকিৎসা ও চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষার জন্য তাঁ'দের যা'তে টাকা দিতে না হয়—তা'র ব্যবস্থা করতে হ'বে। ছাত্রগণের স্বাস্থ্য-চর্চ্চার উৎসাহ দানের নিমিত্ত একটী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন ও উপযুক্ত ব্যায়াম-শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হ'বে। প্রত্যেক কলেজের ছাত্রগণ যা'তে নিজেদের মধ্যে একটী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেন এবং নিজেরাই তা'র কাযকর্ম্ম পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন তা'র ব্যবস্থা করাও এই বিভাগের অন্যতম

উদ্দেশ্য হ'বে। ছাত্রগণকে তা'দের নিজেদের ও জাতির প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হ'বার স্বাধীনতা প্রদান না করলে ছাত্র-আন্দোলন কোন দেশেই সফল হ'তে পারে না।

—ছাত্রাবাস—

উপরন্তু আমরা এই সহরে কতকগুলি সুলভ ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এই ছাত্রাবাসগুলিতে সকল শ্রেণীর ছাত্রের প্রবেশাধিকার থাকবে। সহরে যা'দের থাকবার জায়গা নেই এমন বহু ছাত্রকে শিক্ষা লাভের জন্য অদম্য উৎসাহ নিয়েও অসহায় ভাবে স্থান হ'তে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়া'তে কিংবা অত্যন্ত অপমানজনক অবস্থায় আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। উপযুক্ত অর্থ সাহায্য ব্যতীত এই সকল পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হ'তে পারে না এবং সেই জন্যই আমি সরকারকে এবং উদারহৃদয় জনসাধারণকে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হ'তে অনুরোধ করছি।

—বেকার সমস্যা—

আমাদের যুবকদের ব্যবসায়ের বিষয়ে—কার্য্যকরী শিক্ষা দেবার জন্য যে প্রস্তাব করা হয়েছিল তা'তেও ছাত্রগণের যথেষ্ট উপকার হ'বার সম্ভাবনা। প্রসঙ্গক্রমে, বলে রাখা প্রয়োজন

যে বেকার সমস্যা বহু রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণের সহিত বিজড়িত। সে সকলের সমাধান কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টায় সম্ভব নয় এবং সে দাবা বিশ্ববিদ্যালয় কোন দিন করেও নি। বাংলার যুবকদের পক্ষে আজ বৃত্তি অবলম্বনের বহু পথ বন্ধ হয়েছে কিন্তু বাংলাকে যদি আত্মমর্য্যাদা-বোধসম্পন্ন প্রদেশরূপে টিকে থাকতে হয় তা' হ'লে বাংলার যুবকদিগকে আবার সেই অবলম্বনের পথগুলি খুঁজে বের করতে হ'বে। কেবল চাকরীর উপর নির্ভর করলে চলবে না। আমরা এই দিকে শিক্ষিত যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছি। যত সাধু উপদেশই দেওয়া হউক্ না কেন, তা'তে এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটতে পারে না। চতুর্দ্দিক হ'তে আমাদিগকে কায আরম্ভ করতে হ'বে। সূচনায় তা' যত সামান্যই হউক্ না কেন শিল্প, বাণিজ্য এবং ব্যবসায়ের সকল বিষয়ের সহিত যোগ স্থাপনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় যে যে চেষ্টা সুরু করেছেন—তা'তে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হ'তে পারে।

—অনুষ্ঠান পদ্ধতি -

সম্প্রতি এই অনুষ্ঠান-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাকে কতকগুলি প্রশ্ন করা হয়েছে। আমরা কোন বিশেষ কার্য্য তালিকা অনুসরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নই। ক্রমশঃ কার্য্য-তালিকার পরিবর্ত্তন

হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এর ক্রমবিস্তার সাধনের প্রস্তাব করা হ'লে বিশ্ববিদ্যালয় সে সম্বন্ধে যথোচিতভাবে বিবেচনা করবেন, কিন্তু এ আমি স্পষ্ট করেই বলে রাখছি যে অদ্যকার এই অনুষ্ঠানকে কেবল উৎসবের আকার দান করা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল না।

—উৎসবের উদ্দেশ্য—

প্রত্যেক কলেজ ও স্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে যা'তে সঙ্ঘবদ্ধ কর্ম্মের প্রেরণা জাগ্রৎ হয় সেই হচ্ছে এই অনুষ্ঠানের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বাংলার বিভিন্ন কলেজে আজ ৪০ হাজার যুবক শিক্ষা লাভ করছেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণের সাহায্যে তাঁ'দের অর্দ্ধেকেরও যদি বুদ্ধি, স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠন সম্ভব হয়, তা' হ'লে নূতন বাংলা গড়ে উঠবে—বাঙ্গালীকে কা'রও নেতৃত্বাধীন থাকতে হ'বে না। বাঙ্গালাই তখন নেতৃত্ব করবে। মুহূর্ত্তের আহ্বানে বাংলার হাজার হাজার সুস্থ, সবল ও শিক্ষিত যুবক—হিন্দু, মোসলমান ও খৃষ্টান তখন জাতির আহবানে সাড়া দেবে। সত্য ও সততা—প্রগতি ও একতা এবং স্বাধীনতার পতাকা হস্তে অগ্রসর হ'বার জন্য প্রস্তুত থাকবে। আজ আমার তরুণ বন্ধুগণ যে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে দলে দলে এখানে সমবেত হয়েছেন ইহাই উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি জনসাধারণের চিত্তে জাতীয় ভাব ও চেতনা জাগরিত করতে হয় তা'হ'লে যুবসংগঠনের জন্য এবং গঠনমূলক কার্য্যে তাঁ'দের শিক্ষা দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করতে হ'বে।

আমাদের কার্য্যে অসংখ্য দুরূহ বাধা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পুনর্গঠন কার্য্যে যে অসুবিধা ভোগ করতে হয় তা'ও বিরাট।

অবিশ্রান্ত ও সমবেত প্রচেষ্টা ব্যতীত আমরা লক্ষ্য স্থলে উপনীত হ'তে পারব না সত্য কিন্তু তা'র অভাবে আমাদের নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। বাংলাকে যদি ভারতের পুনর্গঠনে যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করতে হয়, তা' হ'লে উহাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে সুস্থ, সবল, দৃঢ়সঙ্কল্প, আত্ম-নির্ভরশীল, দেশ ও আদর্শের এক নিষ্ঠ অনুরাগী নর নারী গঠন করতে হ'বে, তাঁ'রা ভাবাবেগে বিচলিত হ'বেন না, তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দেবেন। এক দিকে নেতৃত্বের ক্ষমতা যেমন তাঁ'দের থাকবে, তেমনই সৈনিক হ'বার অভ্যাসও তাঁ'রা রাখবেন। শৃঙ্খলা ও কর্ত্তব্যের প্রতি গভীর অনুরাগ ল'য়ে তাঁ'রা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'বেন। শ্রেণী বা সম্প্রদায় হিসাবে তাঁ'রা কোন কায করবেন না। সঙ্ঘবদ্ধ, সমবেত প্রচেষ্টায় তাঁ'রা সমাজের মঙ্গল এবং জাতির শ্রেষ্ঠ স্বার্থ সাধনের জন্য

যত্নবান্ হ'বেন। এই আদর্শকে আমরা যেন মুহূর্ত্তের জন্যও অসম্ভব মনে না করি।

বাংলার সন্তানগণ কি মাতৃভূমির পুনরভ্যুত্থানের জন্য মহৎ কার্য্য করেন নি?—তাঁ'দের আদর্শ যেন এই বিশ্ববিদ্যালয়কে—শিক্ষক ও ছাত্রগণকে সমান ভাবে অনুপ্রাণিত করে। যাঁ'রা আজ জাতীয় কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁ'দের দায়িত্ব বিপুল, সে দায়িত্ব ত্যাগ করবার ক্ষমতা তাঁ'দের নেই।

উপসংহারে আমি প্রার্থনা করি যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় যেন জাতির শিক্ষা, স্বাধীনতা ও অগ্রগতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং শ্রেণী ও সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকলে যেন এতে যোগদান করতে পারেন। আজ ঐক্যতান বাদ্যে, জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম ছত্র ঝঙ্কৃত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশেষ করে সঙ্গীত রচনা করেছেন, তা'র অর্থ :—

আমরা হিন্দু, মোসলমান ও খৃষ্টান সকলে মিলে যেন
সকল স্বার্থের উপর জাতির স্বার্থকে স্থান দিতে পারি।

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ পিতার মধ্যম পুত্র। তাঁ'র জন্ম হয়েছিল ইংরাজী ১৯০১ সালে। এখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৯।৪০ বছর।

সম্প্রতি তিনি হিন্দু মহাসভার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্রব থাকায় ও নানা কার্য্যে

রত থাকায় দিন দিন তাঁ'র যশঃসৌরভে দিঙ্‌মণ্ডল আমোদিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিতচিকীর্ষার নিমিত্ত তাঁ'র পরম মহনীয় জনকের আরব্ধ কার্য্যগুলি তিনি প্রায়ই সমাপ্ত করে তুলেছেন। পিতার ন্যায় তিনিও বিভিন্ন বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান হ'তে বহু উপাধি ভূষণে সমলঙ্কৃত হয়েছেন ও হচ্ছেন।

দেশবরেণ্য পিতার উপযুক্ত সন্তান তিনি। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে সাফল্য মণ্ডিত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। ভাইস্-চ্যান্সেলারা না করলেও তাঁ'র মন, তাঁ'র প্রয়াস সর্ব্বদাই রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি করে নিয়োজিত। ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে, তাঁ'র মত এত অল্প বয়সে কেউ-ই এত গুরু দায়িত্বপূর্ণ, এত বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার পদ প্রাপ্ত হন নি। প্রতিভা-ভাস্বর শ্যামাপ্রসাদ ঐ পদ অলঙ্কৃতও করেছেন চার চার বছর কাল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁ'র অনন্যসাধারণ বাগ্মিতার কথা কে না জানে? যাঁ'রাই তাঁ'র সঙ্গে আলাপ, আলোচনা করেছেন তাঁ'রাই জ্ঞাত আছেন তিনি কেমন অমায়িক, কেমন সদ্ভাষী, সৌম্য প্রকৃতিবিশিষ্ট ও বন্ধু-বৎসল। তাঁ'র উদারতার বহু উদাহরণ বহুজন, বহুভাবে পেয়েছেন ও পেয়ে আসছেন। কর্ম্মী বাঙ্গালার আদর্শ তিনি। তাঁ'র কর্ম্মশীলতার ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠছে হিন্দু মহাসভার বিবিধ বিচিত্র মহদনুষ্ঠানাবদানে।

অহঙ্কারশূন্য, অসামান্য কার্য্যকুশলতার জন্য, স্থির, ধীর স্বভাবের জন্য, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার নিমিত্ত, নিষ্কলুষ চরিত্রের জন্য তিনি অতি অল্পকাল মধ্যেই অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

বাংলার গভর্ণর লর্ড ব্র্যাবোর্ণ যখন তাঁকে মহা সম্মানজনক ডক্টর্ উপাধি দান করেন তখন সসম্ভ্রমে বলেছিলেন :—

"তিনি শুধু তাঁ'র মহামতি জনকের উপযুক্ততম পুত্র বলেই সুপরিচিত ন'ন—তিনি স্বীয় গৌরবেই—আত্মগুণগ্রামেই প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হয়েছেন।"

শ্যামাপ্রসাদ পিতার আরব্ধ কর্ম্ম সু-সম্পন্ন করে ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন, তা'তো আগেই বলেছি। তাঁ'র জীবনের সর্ব্বপ্রধান গৌরব আমরা বলব—**বাঙ্গালা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা।** আর কিছু না করলেও শুধু এই মহতোমহীয়ান্ অবদানের নিমিত্তই তিনি অমর হ'য়ে থাকবেন। তাঁ'র আদর্শ আজ সারা দেশে অনুসৃত হচ্ছে, বেকার শিক্ষিত যুবকদের জন্য তিনি সরকারী, বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানাবলীর সহায়তায় "এপ্‌পয়েন্ট্‌মেন্ট্ বোর্ড" স্থাপন করেছেন। তা'তে শ্রেষ্ঠব্যবসায়িগণ শিল্প ও ব্যবসায় সম্পর্কে বক্তৃতা করে শিক্ষা দিচ্ছেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ বাঙ্গালীর পরমারাধ্যা শ্যামা মায়ের প্রসাদের মতই বাঙ্গালার জন্য সুচির কাল জীবিত থাকুন্।

—বর্ত্তমান ভাইস্ চ্যান্সেলার—

খান্ বাহাদুর

—স্যার মোহাম্মদ আজিজ্-উল্-হক্—

বাংলা দেশে কে না জানে শান্তিপুরের নাম? সুদীর্ঘকাল শান্তিপুর নানাভাবে বাংলার ও বাঙ্গালীর গৌরব সংবর্দ্ধন করে আসছে। এখানকার হিন্দু ও মোসলমানগণের শিক্ষা-প্রবাহে সারা বাংলার মনের কালিমা বহুদিন হ'তেই ধৌত হয়ে যাচ্ছে। জ্ঞান ও ভক্তির প্লাবনে একদিন "শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়" হয়েছিল। বাংলা দেশে যাঁ'র মত জ্ঞানী ও গুণী অদ্যাপি দেখা যায় নি—যাঁ'র আদর্শের তুলনা কোন কালে, পৃথিবীর কোন অঞ্চলে দেখা দেয় নি, অনর্পিতধনদানকারী সেই কলিকলুষহরণ, পতিতপাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে যিনি কাতর আহ্বানে বাংলার নদীয়ার—নবদ্বীপে এনেছিলেন, সেই পরম জ্ঞানী ও মহাভক্তিমান্ শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্য্য দেবও এই শান্তিপুরকেই একদিন যে নানা দুঃখ দৈন্যক্লিষ্ট বাংলার প্রকৃত

শান্তি-পুর করে রেখেছিলেন—সে সব ভুলবার নয়—কেউ ভুলতে পারে না। শান্তিপুর বহুকাল অবধিই লীলাময়—ভাবময়—নানা শিক্ষা-ঐশ্বর্য্যময়।

শান্তি-পুরের সেই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, ভাব-প্রবণা ভূমিতেই মোসলমান কুল ধন্য করতে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে দেখা দিয়েছিলেন—মরহুম কবি মোজাম্মেল হক্ সাহেব। দীর্ঘ হ'তে সুদীর্ঘ কাল তাঁ'র হৃদয়প্লাবী কবিত্ব-সুধায় বাঙ্গালী হিন্দু মোসলমান নরনারী—আবালবৃদ্ধবনিতা আনন্দ-উদ্বেল হ'য়ে আসছেন। অমৃতবর্ষী, সুকবি ও সু-সাহিত্যিক মোজাম্মেল হক্ সাহেব হিন্দু, বিশেষ করে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মোসলমান জনগণের মনে যে পরমোজ্জ্বল, সুষমা-মধুর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, বাংলা সাহিত্য থাকবে, বাঙ্গালীর মনে কবিত্বের লহরী লীলা করবে, ততদিন সে আসন, সে সুধানিষ্যন্দী বীণার তান উত্তরোত্তর সমুজ্জ্বল, উত্তরোত্তর মধুরতর হ'য়ে উঠ্‌তেই থাকবে, সন্দেহ নেই। কবির কৃতী পুত্র আফ্‌জালুল্ হক্ সাহেবও কলকাতায় মুস্লিম্ লাইব্রেরী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশালয় স্থাপন করে, নানা দেশহিতকর কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে, তাঁ'র কীর্ত্তি বিস্তার করছেন সারা দেশময়।

তাঁ'রই পুণ্য-স্মৃতি-সুরভিপূর্ত-বংশে, তাঁ'রই সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র রূপে, আজ হ'তে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বাংলা ১২৯৭

ইংরেজী ১৮৯২ অব্দে পুণ্যাত্মা মহাভাগ্যবান্ মৌলভী মনিরুদ্দিন আহ্মদ্ সাহেবের বংশ-গৌরব রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন আমাদের সর্ব্বজনসমাদৃত বর্ত্তমান ভাইস্-চ্যান্সেলার অনারেবল্ মৌলভী মোহাম্মদ স্যার্ আজিজ্-উল্-হক্, সি, আই, ই, বি, এল্, এম্, এল্, এ, খান বাহাদুর।

গ্রাম্য, সরলতাভূয়িষ্ঠ, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সম্পূর্ণ স্বদেশী ভাবাপন্ন, সুপবিত্র মোসলমান গৃহস্থ-গৃহে জন্মগ্রহণ করে, স্যার্ আজিজ-উল্ হক্ সাহেব সুকুমার শৈশবে স্ব-গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যায়তন "শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল্ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে" যথারীতি অধ্যয়ন পরিসমাপ্ত করেন ও কল্‌কাতার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা প্রতিষ্ঠান প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হন। তথা হ'তে সগৌরবে বি, এ ডিগ্রী লাভ করেন। তা'রপর ইউনিভারসিটি "ল কলেজ্" হ'তে "ল" পাশ্ করে বিগত ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁ'র নিজের জেলা নদীয়ার সুপ্রসিদ্ধ জনপদ কৃষ্ণনগর জজ্ কোর্টের উকীলরূপে তত্রত্য "বারে" যোগদান করেন।

প্রতিভা লুক্কায়িত থাকবার বস্তু নয়—আগুন চাপা থাকে না। লেলিহান শিখা তা'র দেখা দেয়ই দেয়। তিনি যে অদূরভবিষ্যতে জন-নেতা, বহু বিষয়ে অগ্রণী হ'বেন, সে লক্ষণ ফুটে উঠেছিল তাঁ'র ছাত্র-জীবনেই। তিনি ১৯১১-১২ সালে

কলকাতার মোস্‌লিম্ ইনষ্টিটিউটের সেক্রেটারীর পদ সমলঙ্কৃত করেন। তা'রপর—"বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মেহোমেডান্ এডুকেশনাল্ এসোসিয়েসনের" জয়েণ্ট্ সেক্রেটারী হন। "বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মোসলিম্ লিগের" এসিষ্ট্যাণ্ট্ সেক্রেটারী পদও লাভ করেন এবং কল্‌কাতায় "জার্ণাল্ অফ্ দি মোসলিম্ ইনষ্টিটিউটের" সম্পাদক পদেও বৃত হন।

কৃষ্ণনগরের "বারে" যোগদান করে কিছুদিন যেতে না যেতেই তিনি "হিষ্টোরী এণ্ড্ প্রোব্লেম্ অফ্ মোস্‌লিম্ এডুকেশন্ ইন্ বেঙ্গল" নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। এই বিষয় নিয়ে, এমন গ্রন্থ অদ্যাবধি কেহই রচনা করেন নি। গ্রন্থখানির ভাষা ও বিষয় বস্তুর ঐশ্বর্য্য এতই মনোরম ও মূল্যবান্ হয়েছিল যে স্বনামধন্য, কল্‌কাতা ইউনিভারসিটি কমিশনের প্রেসিডেণ্ট্ স্যার্ মাইকেল স্যাড্‌লার্ সাহেব পর্য্যন্ত এর ভূয়সী প্রশংসা কীর্ত্তন করেন এবং উক্ত কমিশনের অন্যতম বিখ্যাত সভ্য মিঃ জে, ডাব্লিউ, গ্রেগরী সাহেবও গ্রন্থখানি পাঠ করে মুগ্ধ হ'য়ে বহু প্রশংসা করেন ও তাঁ'দের সেই সুবিখ্যাত রিপোর্টের স্থানে স্থানে এই গ্রন্থের বহু মন্তব্য উদ্ধার করে এবং উল্লেখ করে গ্রন্থখানির গুণবত্তা সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করেন। তাঁ'দের মতে—বাংলায় মোসলমানের শিক্ষা সম্পর্কে এমন তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নেই।

স্যার আজিজ্-উল্ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছ' ছ' বছর কাল "ফেলো" ছিলেন এবং যদবধি না বাংলার মন্ত্রী হন তদবধি এবং প্রায় ঐ কালই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টেরও বহু সম্মানিত সভ্য পদে নিযুক্ত থাকেন। তা'র পরও তিনি আবার 'ফেলো' নির্ব্বাচিত হন। কাযের লোক তিনি—নামে মাত্র মেম্বার না থেকে স্যার আজিজ্-উল্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন "একটিভ্ মেম্বার"-ই ছিলেন। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যে "রি-অরগেনিজেশন্ কমিটী" হয় তা'তেও তিনি সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন—সেই "রি-অরগেনিজেশন্ কমিটীর" রিপোর্ট অনুসারেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান যাবতীয় কায কর্ম্ম এবং গঠনমূলক বিধি ব্যবস্থা চলছে।

স্যার আজিজ্-উল্ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু পূর্ব্ব হ'তেই নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তিনি বহু পূর্ব্বেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'ফ্যাকালটী অফ্ লয়ের' সভ্য ছিলেন, শুধু "ল"-ই নয় আর্টেরও সভ্য ছিলেন। তিনি "বোর্ড অফ্ ষ্টাডিস্ ইন্ ইকোনমিকস্ এণ্ড্ স্যানস্‌ক্রিটিক্ ল্যাঙ্গোয়েজেস্ বোর্ডের" মেম্বারও ছিলেন। তা'রপর—"ল"য়ের একজামিনার বা পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এতদ্ভিন্ন তিনি সসম্মানে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক পদেও বৃত হয়েছিলেন।

• •

স্যার্ আজিজ্-উল্ কয়েক বছর "সেন্ট্রাল্ টেক্সট্ বুক্

কমিটীর”ও মেম্বার হন। শুধু মেম্বারই ন’ন—তত্রত্য “হিষ্টোরী সিলেবাস্ কমিটী অফ্ বিব্লিকাল্ এণ্ড্ ইস্লামিক্ নেমস্ ট্র্যান্স্লিটারেশন্ কমিটী’র চ্যায়ারম্যানও নিযুক্ত হন। তা’রপর কিছুকাল ‘টেক্স্‌ট্ বুক্ কমিটীর’ ‘হিষ্টোরী বোর্ডের’ চ্যায়ারম্যানের পদও অলঙ্কৃত করেন। তাঁ’র নিজের জেলার কৃষ্ণনগর টেক্‌নি-ক্যাল্ স্কুলের তিনি সেক্রেটারী। এই শ্রেণীর স্কুল গুলির মধ্যে এই স্কুলটী বাংলাদেশের প্রধানতম স্কুল বলে গণনায় হয়ে থাকে।

কৃষ্ণনগর কলেজ ও স্কুলের গভার্ণীং বডির মেম্বার রূপে নদীয়া জেলার অপরাপর বহু বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী এবং প্রেসিডেণ্ট্ রূপে খান্ বাহাদুর নদীয়া জেলার শিক্ষা-সমৃদ্ধির এক জন অগ্রগণ্য পুরুষরূপে সুদীর্ঘকাল সবিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করে আসছেন। বহুবিধ জনহিতকর কর্ম্মে তাঁ’র মঙ্গল-হস্তের কর্ম্মঠ ও বলিষ্ঠ নিদর্শন অহর্নিশ আমরা দেদীপ্যমান্ দেখে আসছি।

এতদ্ব্যতীত তিনি “স্কাউট্ মুভ্‌মেণ্টে”ও যোগদান করে সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি “বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল্ বয়্-স্কাউটস্ এসোসিয়েসনের” এক্‌জিকিউটিভ্ কমিটীরও একজন মেম্বার। একাকী বহু দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মের নেতৃত্ব গ্রহণ করে সুদীর্ঘ কালাবধি সংশ্লিষ্ট জনগণের অশেষ প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা ভাজন হ’য়ে আসছেন। তাঁ’র অনন্যসাধারণ প্রতিভা সকলেরই মনে অপরিসীম আধিপত্য বিস্তার করেছে। বাংলার

প্রাচীন ও নবীন বহু উন্নতি প্রয়াসী গরিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানেই তাঁ'র বলিষ্ঠ হস্তের বহুবিধ অবদান পরিলক্ষিত হচ্ছে। "বেঙ্গল্ টেরিটরিয়াল্ এড্‌ভাইসারী কমিটী"রও তিনি কিয়ৎকাল মেম্বার ছিলেন। "কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী"র চ্যায়ারম্যান্‌রূপেও তাঁ'কে আমরা খ্যাতি লাভ করতে দেখতে পাই।

বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ "লোণ্ণিয়ান্ কমিটী"র ছিলেন তিনিই এক মাত্র বাঙ্গালী প্রতিনিধি। সেখানে সেই কমিটীর, বিশিষ্ট সভ্যবৃন্দের সঙ্গে জটিলতা ও দুরূহতাপূর্ণ যাবতীয় কর্মে স্যার্ আজিজ্-উল্ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

"বেঙ্গল্ ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারী কমিটী"র মেম্বার রূপে তিনি বীরভূম জেলার "ইকোনমিক্ সার্ভের" কার্য নিষ্পন্ন করেছেন। তা' ছাড়া তিনি "বেঙ্গল বোর্ড অফ্ ইণ্ডাষ্ট্রিসের"ও ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট্ ছিলেন। "বেঙ্গল জুট্ এন্‌কোয়ারী কমিটী"র তিনি সভ্য ছিলেন। "বেঙ্গল বোর্ড অফ্ ইকোনমিক্ এন্‌কোয়ারীর"ও তিনি একজন সম্মানিত সভ্য ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁ'কে আমরা দেখতে পাই—"বেঙ্গল-রিট্রেঞ্চমেণ্ট্ কমিটী"র মেম্বার রূপে।

বিগত ১৯২৮ সাল হ'তেই খান্ বাহাদুর "বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলে"র সভ্যরূপে আত্মনিয়োগ করেন। "পাব্লিক্ একাউণ্টস্" কমিটীতেও তিনি আট বছর মেম্বার

ছিলেন। "সিলেক্ট্ কমিটী"র প্রত্যেক বিশেষ বিলেই তাঁর অবদান দেদীপ্যমান্। "বেঙ্গল মানি লেণ্ডারস্ বিল্" বা বঙ্গীয় মহাজনী আইন তাঁরই প্রবর্ত্তিত। তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত এই বিলটাকে কাউন্সিলে উঠিয়ে পাশ্ করাতে সমর্থ হয়েছেন। বর্ত্তমানে এতদ্রূপ বহু কমিটীরই তিনি মেম্বার। খাঁ বাহাদুর সর্ব্বদাই জনসাধারণের পক্ষ সমর্থন করে, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয়ে আসছেন। তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও তেজস্বিতাপূর্ণ বাগ্মিতায় সকলেই মুগ্ধ। বিগত কাউন্সিলের "টিনেন্সী ডিবেটে" তাঁর খ্যাতি চার দিক আমোদিত করেছে।

"বেঙ্গল ও আসামের পোষ্টাল্ আর, এম, এস্, এসোসিয়েশনের" তিনি ভাইস্-প্রেসিডেন্ট্ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত 'নদীয়া পোষ্টাল্ এণ্ড্ আর্, এম্, এস্ ইউনিয়ানেরও' প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

গত ১৯২৬ ও ১৯২৭ সালে "নদীয়া এক্‌জিবিশন" নামে যে প্রদর্শনী হয়, সেই প্রদর্শনীর তিনি সেক্রেটারীর পদ সমলঙ্কৃত করেন।

তাঁর পর—পাঁচ বছর কাল সমভাবে বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত'ই, বি, রেলওয়ের এড্ভাইসারী কমিটীর' মেম্বার রূপে

সংস্থা পরিচালনা করেছেন। এতদ্ভিন্ন "আই, পি, এস্ সিলেকসন্ কমিটিস্ এণ্ড্ বোর্ডসের"ও তিনি মেম্বার ছিলেন।

কিছু দিন ধরে তিনি নদীয়ার "পাব্লিক্ প্রসিকিউটার" ছিলেন। ব্যবসায় অপেক্ষা তাঁ'র দিন কাটে জনসাধারণের হিতজনক বহুবিধ কর্ম্মে। নিজের স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থেই তাঁ'র জীবন ও ধন সম্পত্তির সমধিক ব্যবহার সর্ব্বদা প্রত্যক্ষীভূত হচ্ছে।

অতঃপর তাঁ'র "এডুকেশন মিনিষ্টারীর" কথা কিছু বলছি :—শিক্ষা-মন্ত্রীরূপে তাঁ'র কাযের ছিল না অন্ত। সব্যসাচী অর্জ্জুনের ন্যায় তিনি একাকী সহস্র কর্ম্মে, সহস্র কর্ম্মধারের সঙ্গে সমভাবে লিপ্ত থাকতেন। তিনি অষ্টপ্রহর প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত অসংখ্য স্কীম্ বা কার্য্য-প্রণালী রচনা করে কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করতেন। মেয়েদের স্কুল সম্পর্কে, শিক্ষা সম্পর্কে, মোসলিম গার্লসদের গভর্ণমেণ্ট্ হাই স্কুল সম্পর্কে, তা'দের স্কলারসিপ্ বা বৃত্তি সম্পর্কে এবং কর্ম্ম-প্রণালী সম্পর্কে নানা নিয়ম ও আইন-কানুন প্রণয়ন করে যুগপৎ সম্ভ্রম ও বিস্ময়ে সকলকে অভিভূত করে তুলেছিলেন। তাঁ'রই আন্তরিক অসামান্য চেষ্টায় কলকাতায় "এডুকেশনাল্ একজিবিসনের" অধিবেশন সম্ভব হয়েছিল এবং তদুপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ একত্রে সমবেত হ'তে পেরেছিলেন।

"সেণ্ট্রাল্ বোর্ড অফ্ এডুকেশনের" মেম্বার রূপে "উইমেনস্ এডুকেশন কমিটী অফ্ দি বোর্ডের" প্রেসিডেণ্ট্ রূপে তাঁ'র কৃত কর্ম্ম যে অত্যন্ত মূল্যবান্ বলে পরিগৃহীত হ'তে পারে তা'তে আর সন্দেহ নেই। বলতে গেলে তাঁ'রই চেষ্টাতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গভর্ণমেণ্টের যে দানের বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছিল তা'র সুমীমাংসা হয়ে গেছে। তিনি ভিন্ন অপর কেউ বাংলা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-মন্ত্রী হ'লে কি ব্যবস্থা হ'তো কে জানে! বিগত ১৯৩৭ সালের অপ্রিল মাসে খাঁ বাহাতুর বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ বা লেজিস্লেটিভ্ এসেম্ব্লীর "স্পীকার্" পদ গ্রহণ করে স্বায় অসামান্য কৃতিত্বে অপরাপর ব্যাপারের ন্যায়ই সর্ব্বজনমনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছেন।

তা'রপর—১৯৩৮ সালের ৬ই আগষ্ট্ তারিখে গুণগ্রাহী গভর্ণমেণ্ট্ তাঁ'কে শিক্ষা-সংক্রান্ত অশেষ কর্ম্মের ও কৃতিত্বের চরম পুরস্কার স্বরূপ বিশ্ববিখ্যাত, ভারতের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার রূপে বরণ করে সকলেরই ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। ১৯৩৮—৮ই আগষ্ট্ হ'তে তিনি শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থলে ভাইস্-চ্যান্সেলার রূপে কার্য্য করে আসছেন।

১৯৩৮—১৯৩৯, ১৯৩৯—১৯৪০ আগষ্ট্ পর্য্যন্ত দু'বছর

অতীত হওয়ায় তাঁ'র গুণ মুগ্ধ গভর্ণমেণ্ট্ আবার দু'বছরের জন্য তাঁ'র কার্য্যকাল পরিবর্দ্ধিত করে দিয়েছেন।

তাঁ'র প্রণীত অপর মূল্যবান্ গ্রন্থ-হচ্ছে—"The Man behind the plough"—"লাঙ্গলের পিছনে লোকটী"। রচনা-ভঙ্গীতে, সরসতায়, বিষয় ও প্রামাণ্য সংবাদ-প্রাচুর্য্যে ইতো-মধ্যেই গ্রন্থখানি সর্ব্বদেশীয় বিদ্বজ্জনের নিকট সবিশেষ সমাদৃত হয়েছে ও হচ্ছে।

এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পটস্থ বাক্য গুলির মর্ম্ম উদ্ধৃত করে আমরা আমাদের এই মহামনস্বী ভাইস্ চ্যান্সেলারের সংক্ষিপ্তাতিসংক্ষিপ্ত এই জীবনালেখ্য সসঙ্কোচে সমাপ্ত করছি।

সত্যই স্যার্ আজিজ্-উল্ ঘুরেছেন তাঁ'র জেলার প্রায় সব গ্রামে গ্রামে, দেখা সাক্ষাৎ করেছেন সব গ্রামে গ্রামে—যত সব দায়গ্রস্ত, বিপন্ন, হতাশ গ্রামবাসীদের সঙ্গে নানা-ভাবে। তা'রপর তাঁ'র নিজের কাযে, গভর্ণমেণ্টের কাযে, নানা কাযে, নানারূপে তাঁ'কে ঘুরে বেড়া'তে হয়েছে বাংলার আটাশটী জেলার সর্ব্বত্র, তা'ছাড়া ভারতের সব প্রদেশে প্রদেশে। গ্রামের ইউনিয়ান্ বোর্ডের বিচক্ষণ, দূরদর্শী, সর্ব্বজনপ্রিয় প্রেসিডেণ্ট্ ছিলেন তিনি, স্থানীয় সহরের মিউনিসপ্যালিটীর চেয়ারম্যান্ ছিলেন তিনি, ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের ভাইস্-চ্যায়ারম্যান্ ছিলেন তিনি—প্রভিন্সিয়াল্ ব্যাঙ্কিং কমিটীর, বেঙ্গল্ জুট্ এনকোয়ারী কমিটীর, ইণ্ডিয়ান

ফ্র্যাঞ্চাইজ্ কমিটীর, বোর্ড অফ্ ইকোনমিক্ এন্‌কোয়ারীর, বোর্ড অফ্ ইন্‌ডাষ্ট্রিজের ও বিভিন্ন কমিটীর মেম্বাররূপে স্যার্ আজিজ্-উলের জনসাধারণের দুঃখ দারিদ্র্য, দুর্ব্বলতা এবং অ-শিক্ষা ও কু-শিক্ষার সম্পর্কে সঞ্চিত জ্ঞানের তুলনা হয় না। তাঁ'র জ্ঞান "থিওরেটিকাল্" নয়—সত্যই "প্র্যাক্‌টিকাল্"—বহুমূল্যবান্ তত্ত্বরাজিপূর্ণ এই সর্ব্বজন প্রশংসিত গ্রন্থে তাঁ'র যথেষ্ট প্রমাণ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

তাঁ'র এই সমুদয় অনন্যসাধারণ গুণ-সন্নিপাতে মুগ্ধ হ'য়ে—গুণগ্রাহী গভর্ণমেণ্ট, বিগত নববর্ষোৎসব-দিনে [১৯৪১] তাঁ'কে Knight (Kt) বা স্যার্ উপাধি দানে সম্মানিত করেছেন। দিন দিন তাঁ'র অভ্যুদয়ের আনন্দে—তাঁ'র যশঃ-সৌরভে দিঙ্‌মণ্ডল আমোদিত হচ্ছে। বিগত ১৯৪০ সালের ২রা মার্চ্চ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমাবর্ত্তনোৎসব বা "কনভোকেশন্" হয়েছে, তা'তে সম্মানিত অতিথিরূপে এসে সমাবর্ত্তন-অভিভাষণ বা এড্রেস্ দান করেছিলেন—কাশ্মীরের দেওয়ান্ আমিন্-উল্ মুলুক্ স্যার্ মীরজা এম্, ইসমাইল,কে, সি, আই, ই, সি, আই, ই। তাঁ'কে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন আমাদেরই এই সুযোগ্য ভাইস্ চ্যান্সেলার খাঁ বাহাদুর স্যার্ আজিজ-উল্-হক্ সাহেবই।

সেবার খাঁ বাহাদুর অন্যান্য বহু মূল্যবান্ কথার শেষে তাঁ'র

ভাইস্ চ্যান্সেলারের এড্রেস্ বা অভিভাষণের উপসংহার করেছিলেন্ এই কথা কয়টী বলে :—

"Graduates of this University, I will now conclude by addressing a few words to you. To-day you have formally received your degrees and after years of study your lives have been crowned with academic success. When you go out into the world, you will find that life is much more complex than what you have experienced so fa.. In the struggle of life in making headway play your part nobly and well-worthy of the education you have received. Much will depend on how you shape your future, but wherever you may be be upright yet respectful fearless and yet considerate of the convictions of others. Often we are prone to understand only our point of view and not that of others, remember that the world exists for you and as well as for others and you will be in the long run helping yourselves if you only give a little passage and space to others who require it. Let me conclude this with a parting message from your University—in the same words as I said last year

—Be worthy of your degrees and keep the map of this province and this country before you in your life and career,"

এমন প্রার্থনা—এমন আদেশ—এমন অনুরোধ দেশ-প্রাণ স্যার্ আজিজ্-উল্-হকের মত শিক্ষা-ব্রতী—বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধরগণের আদর্শ-বিধায়ক সুযোগ্য শিক্ষাকর্ণধারেরই সম্পূর্ণ উপযোগী হয়েছে সন্দেহ নেই। সকলেরই তাঁ'র উত্তরোত্তর সুখ-সমৃদ্ধি কামনায় শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করা উচিত। আমাদের দেশীয় মোসলমান তিনি—আমাদের দেশীয় মোসলমান হিসাবে তিনিই এই মহোচ্চ পদে সর্ব্ব প্রথম অভিষিক্ত হয়েছেন। বাংলার হিন্দু ও মোসলমান তাঁ'কে সমভাবে শ্রদ্ধা করে সুতরাং তাঁ'র নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের সামঞ্জস্যমূলক প্রভূত উন্নতিই আমরা একান্ত ভাবে আশা করছি। শ্রীভগবান্ তাঁ'র নিরাময়, সুদীর্ঘ, অমায়িক ও গৌরবময় জীবন দান করুন্।

বিশ্ববিদ্যালয়ের

—সমাবর্ত্তন উৎসব—

"মণি অতুলন ছিল যে গোপন সৃজনের শতদলে—
ভবিষ্যতের অমর সে বীজ আমাদেরি করতলে ॥
অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা সে ঘটনা হ'বে হ'বে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙ্গালীর গৌরবে।"

—সত্যেন্দ্রনাথ।

বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা-কেন্দ্র। যাঁ'রা এর সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হ'য়ে সম্মান ভাজন হ'বার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁ'দেরই যথেষ্ট সম্মাননার নিমিত্ত আবহমানকাল একটী বিশেষ সভার অধিবেশন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার বা কর্ণধারবৃন্দের নির্ব্বাচিত দেশের কোন অগ্রণী ব্যক্তিকর্ত্তৃক সর্ব্বোচ্চ সম্মানলাভকারীব্যক্তিবর্গের গুণগ্রামের উল্লেখপূর্ব্বক বক্তৃতা ও উপাধি পত্র দান করা চলে আসছে—এরই ইংরেজী নাম—কনভোকেশন। কনভোকেশন বা উপাধি-বিতরণী এই

মহাসভায় যা'রা গৌরব লাভ করেন, তাঁ'রা নিমন্ত্রিত হ'য়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট হুড্, গাউন, ক্যাপ্ প্রভৃতি পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করে মহা সম্মানের সহিত স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলে, চ্যান্সেলার্ বা ভাইস্ চ্যান্সেলার্ বা কোন দেশবরেণ্য ব্যক্তি, সমাগত, সমবেত বহু বরেণ্যজনের সমক্ষে সসমাদরে তাঁ'দের প্রাপ্য উপাধি-পত্র তাঁ'দের হাতে দান করে থাকেন। ঘটনাক্রমে উপস্থিত হ'তে না পারলে, যে সমুদয় বিদ্যালয় হ'তে তাঁ'রা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থ সমুপস্থিত হ'য়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করেছেন সেই সব বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহোদয়দের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁ'দের মুদ্রিত উপাধি-পত্রসমূহ প্রেরণও করে থাকেন।

বহু দিন হ'তেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এ প্রথা চলে আসছে কিন্তু সেকালের সঙ্গে বহু বিষয়ে একালের বহু পার্থক্য দেখা দিয়েছে। একালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক উপাধি-বিতরণী সভা—তা'র অভিভাষণাদি দান হয়ে উঠেছে একটা মহা উল্লেখযোগ্য—বিশিষ্ট ঘটনা। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত অ-সংশ্লিষ্ট বিদেশের বিশিষ্ট বিদ্বান্—মনস্বী ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ করে আনয়ন করা হ'য়ে থাকে, তাঁ'রা যে সমুদয় অভিভাষণ দান করেন সে সমুদয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁ'দের সুচিন্তিত মন্তব্য ও ছাত্রদের ভবিষ্যৎ উন্নতি বিধায়ক বিবিধ বিচিত্র উপদেশ সন্নিবিষ্ট

হয়—কলকাতায় মাঝে মাঝে সে পদ্ধতিও সম্প্রতি অনুসৃত হচ্ছে। প্রাচীনতম উপনিষদের যুগের বিশ্ববিদ্যালয়েও যে এইরূপ উপদেশ দেওয়ার প্রথা—এইরূপ উপাধি-বিতরণী সভার অনুষ্ঠান হ'ত, তা' বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। তৈত্তিরীয় নামক উপনিষদ্ হ'তে এমনই একটী উৎসব-সভায় বেদাধ্যাপনান্তে আচার্য্য দেবের শিষ্যের প্রতি উপদেশের কিয়দংশ এস্থলে উল্লেখ করা যাচ্ছে। এখন যে সকল উপদেশ দেওয়া হয়—সে সকলের একটী বিশিষ্ট নমুনা স্বরূপ বিশ্ব-কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত সমাবর্ত্তন-উৎসব অভিভাষণের কিয়দংশও উদ্ধৃত করা গেল। তুলনায় আনন্দ হ'বে নিশ্চয়। সংস্কৃত ভাষায়—উপনিষদের ভাষায়, সে যুগে অভিভাষণ বা উপদেশ দেওয়া হ'ত—এ যুগে হয়—সাধারণতঃ ইংরেজী ভাষায়—রবীন্দ্রনাথ কিন্তু দিয়েছেন বাংলায়।

তৈত্তিরীয়ের যুগের কন্‌ভোকেশন্ এড্রেস্ বা সমাবর্ত্তন-উৎসবের উপদেশ আরম্ভ হয়েছিল এই ভাবে—

"সত্যং বদ, ধর্ম্মং চর, স্বাধ্যায়ন্মা প্রমদঃ।
সত্যান্নপ্রমদিতব্যম্, ধর্ম্মান্নপ্রমদিতব্যম্,
কুশলান্নপ্রমদিতব্যম্।
ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্—স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং
ন প্রমদিতব্যম্।
দেব পিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। ·

পিতৃ দেবোভব, মাতৃদেবোভব, আচার্য্য দেবোভব,
অতিথি দেবোভব।
যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি, তানি সেবিতব্যানি,
নো ইতরাণি।

• • • •

এষ আদেশঃ, এষ উপদেশঃ
এষা বেদোপনিষৎ
এতদনুশাসনম্
এষ মুপাসিতব্যং ; এবমুচৈতদুপাস্যম্।"

"সত্য কথা বলবে তোমরা, ধর্ম্মাচরণ করবে তোমরা, বেদ অধ্যয়নে ঔদাস্য করবে না তোমরা—

• • • •

পিতাকে দেবতার মত পূজা করবে, মাতাকে দেবতার মত পূজা করবে, আচার্য্যকে দেবতার মত পূজা করবে।

যে সব কায অনিন্দনীয় সেই সকল করবে তোমরা—নিন্দনীয় কায কখনও করবে না।

এই হচ্ছে আদেশ, এই হচ্ছে তোমাদের উপদেশ—এই হচ্ছে অনুশাসন, এইরূপ আচরণ হচ্ছে তোমাদের কর্ত্তব্য। এই সব পালন করবে তোমরা—আজ হ'তে।"

এখনকার অভিভাষণের উপদেশেও প্রায় এই সব কথাই

বলা হয়। বিশ্ব-কবীন্দ্রের অভিভাষণের পর স্যার আশুতোষের একটী ইংরেজী অভিভাষণের কিয়দংশ উদ্ধৃত করলেম, আর বিগত ১৯৩৩ সালের ২৫ শে মার্চ্চ তখনকার ভাইস্ চ্যান্সেলার্ স্যার্ হাসান সার্ওয়ার্দ্দী যে ইংরেজী অভিভাষণ দান করেছিলেন, তা'রও কিয়দংশ উদ্ধৃত হ'ল। ইংরেজীতে কেমন করে বলা হয় তা'র সংক্ষিপ্ত নমুনা এতে প্রকাশিত হ'বে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন-উৎসবে বিশ্ব-কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের সারাংশ [১৯৩৩]

—"বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ"—

যে বৎসর বিশ্ব-কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে অভিভাষণ প্রদান করেন, সে হচ্ছে ১৯৩৩ সাল, তখন ভাইস্ চ্যান্সেলার হয়েছেন, স্যার্ হাসান সার্‌ওয়ার্দ্দী। দেশময় নব যুগের প্রবর্ত্তন হয়েছে। মোসলমানদের মধ্যেও নব ভাবের— নবপ্রেরণা দেখা দিয়েছে, মোসলমানগণও পূর্ব্বগরিমা স্মরণ করে বিবিধ ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন—ফলে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়েরও কর্ণধারত্ব তাঁ'রা এতদিন পরে, পরমযত্নে গ্রহণ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাপ্ না থাকলেও বিশ্ববিশ্রুত চিন্তাশীল, জগতের শ্রেষ্ঠ কবি সম্মানে সম্মানিত, নোবেল্ প্রাইজ্ পেয়ে সর্ব্বজনবরেণ্য বাঙ্গালীকবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিজ্ঞ কর্তৃপক্ষের বিবেচনায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ পদবীপ্রাপ্তগণকে

পদবী দান কালে উপদেশ দিতে আহূত হ'লেন। তা'র পর তিনি সেই বৎসরই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার প্রধান অধ্যাপক হয়ে কমলা লেকচারে "মানুষের ধর্ম্ম" শীর্ষক বক্তৃতা দান করলেন। ত্রিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী বিশ্ব-কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সেই "বিশ্ব বিদ্যালয়ের রূপ' নামক অভিভাষণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেপেছেন, আট আনা মূল্যে বিক্রীত হচ্ছে, সুতরাং সহজেই সংগ্রহ করে পড়া যায়—সকলেরই পড়া উচিত। কত ভাবের, কত নতুন কথাই যে তা'তে আছে, না পড়লে, না ভাবলে বুঝি লিখে বা বলে প্রকাশ করা যায় না। তা'র মাঝখান থেকে, বেছে কয়েকটা কথা মাত্র এখানে দিচ্ছি—শুধু সমাবর্ত্তন-উৎসবের অভিভাষণের সামঞ্জস্য দেখা'তে। আগেকার বলা ও এখনকার বলার ভঙ্গীতে কত পার্থক্য জন্মেছে তা' বেশ দেখা যা'বে এতে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই বলছেন,—

"অপরিচিত আসনে অনভ্যস্ত কর্ত্তব্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে আহ্বান করেছেন। তার প্রত্যুত্তরে আমি আমার সাদর অভিবাদন জানাই।'

• • • •

বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র। সাধারণ ভাবে বলা চলে সে সাধনা বিদ্যার সাধনা। . .

• • • •

দেশে যে-বিদ্যা, যে-মননধারা, যে-ইতিহাস কথা দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত ছিল, এমন কি, দিগন্তের কাছে বিলীনপ্রায় হয়ে এসেচে, এক সময়ে তাকে সংগ্রহ করা, তাকে সংহত করার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের মনে। নিজের চিৎপ্রকর্ষের যুগব্যাপী ঐশ্বর্য্যকে সুস্পষ্টরূপে নিজের গোচর করতে না পারলে তা ক্রমশ অনাদরে, অপরিচয়ে জীর্ণ হয়ে বিলুপ্ত হয়। কোনো এক কালে এই আশঙ্কায় দেশ সচেতন হয়ে উঠেছিল; দেশ একান্ত ইচ্ছা করেছিল, আপন সূত্রচ্ছিন্ন রত্নগুলিকে উদ্ধার করতে, সংগ্রহ করতে, তাকে সূত্রবদ্ধ করে সমগ্র করতে এবং তাকে সর্ব্ব লোকের এবং সর্ব্ব কালের ব্যবহারে উৎসর্গ করতে। দেশ আপন বিরাট চিন্ময়ী প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষরূপে সমাজে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করতে উৎসুক হয়ে উঠল, যা আবদ্ধ ছিল বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতের অধিকারে, তাকেই অনবচ্ছিন্নরূপে সর্ব্বসাধারণের আয়ত্তগোচর করবার এ এক আশ্চর্য্য অধ্যবসায়। এর মধ্যে একটি প্রবল চেষ্টা, অক্লান্ত সাধনা, একটি সমগ্র দৃষ্টি ছিল।

•　　•　　•　　•

আজ নিজের প্রতি, মানুষের প্রতি, নিজের সাধনার প্রতি আলস্যবিজড়িত অশ্রদ্ধার দিনে বিশেষ করে আমাদের মনে করবার সময় এসেচে যে, মানব ইতিহাসে সর্ব্বাগ্রে

ভারতবর্ষেই জ্ঞানের বিশ্ব-দান-যজ্ঞ উদার দাক্ষিণ্যের সঙ্গে প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। বাংলা দেশের পক্ষ থেকে আরো একটি কথা আমাদের মনে রাখবার যোগ্য,—নালন্দার হিউয়েন্ সাঙের যিনি গুরু ছিলেন তিনি ছিলেন বাঙালী, তাঁর নাম শীলভদ্র; তিনি বাংলা দেশের কোনো এক স্থানের রাজা ছিলেন; রাজ্য ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। এই সঙ্ঘে যাঁরা শিক্ষা দান করতেন তাঁদের সকলের মধ্যে একলা কেবল তিনিই সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারতেন।

• • • •

ভারতীয় বিদ্যা বলে যে কোনো একটা পদার্থ যে কোথাও আছে এই বিদ্যালয়ে গোড়াতেই তাকে অস্বীকার করা হয়েচে। এর স্বভাবটা পৃথিবীর সকল য়ুনিভার্সিটির একেবারে বিপরীত। এর দানের বিভাগ অবরুদ্ধ, কেবল গ্রহণের বিভাগ আপন ক্ষুধিত কবল উদঘাটিত করে আছে। তাতে গ্রহণের কাজও ঠিকমতো ঘটে না, কেন না, যেখানে দেওয়া নেওয়ার চলাচল নেই সেখানে পাওয়াটাই থাকে অসম্পূর্ণ।

• • • •

আধুনিক কালে জীবন যাত্রা সকল দিকেই জটিল। নূতন নূতন নানা সমস্যার আলোড়নে মানুষের মন সর্ব্বদাই উৎক্ষুব্ধ। নিয়ত তার নানা প্রশ্নের নানা উত্তর, তার নানা বেদনায়

নানা প্রকাশ সমাজে তরঙ্গিত, সাহিত্যে বিচিত্র ভঙ্গীতে আবর্তিত।

• • • •

দেশের জনসাধারণের সমস্ত দুরূহ প্রশ্ন, গুরুতর প্রয়োজন, কঠোর বেদনা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানে দূরের বিদ্যাকে আমরা আয়ত্ত করি, জড় পদার্থের মতো বিশ্লেষণের দ্বারা, সমগ্র উপলব্ধির দ্বারা নয়। আমরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাক্য মুখস্থ করি এবং সেই টুক্‌রো-করা মুখস্থ বিদ্যার পরীক্ষা দিয়ে নিষ্কৃতি পাই। টেক্‌স্‌টবুক্‌ সংলগ্ন আমাদের মন পরাশ্রিত প্রাণীর মতো নিজের খাদ্য নিজে সংগ্রহ করবার, নিজে উদ্ভাবন করবার শক্তি হারিয়েচে।

ইংরেজি ভাষা আমাদের প্রয়োজনের ভাষা, এই জন্যে সমস্ত শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে এই বিদেশী ভাষার প্রতি আমাদের লোভ; সে প্রেমিকের প্রীতি নয়, কৃপণের আসক্তি। ইংরেজি সাহিত্য পড়ি, প্রধান লক্ষ্য থাকে, ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করা, অর্থাৎ ফুলের কীটের মতো আমাদের মন, মধুকরের মতো নয়, মুষ্টি ভিক্ষায় যে দান সংগ্রহ করি, ফর্দ ধরে তার পরীক্ষা দিয়ে থাকি।

• • • •

এখানকার পরীক্ষা পদ্ধতিতে যে ফলের প্রতি দৃষ্টি সে

আহরণ করা ফল, ফলন-করা ফল নয়! দৈন্যের নিষ্ঠুর তাগিদে এমনতরো শিক্ষার প্রতি দেশের লোভ আছে কিন্তু ভক্তি নেই। তাই শিক্ষক ও ছাত্রদের উদ্যমকে পরিপূর্ণ মাত্রায় সতর্ক করে রাখবার প্রয়োজন হয় না। কেন না দেশের প্রত্যাশা উচ্চ নয়, বাজার দরের হিসাব করে যে পরীক্ষার মার্কা সে চায়, সত্যের নিকষে তার মূল্য অতি সামান্য, এই জন্য দুর্মূল্য বিদ্যাকে সম্পূর্ণ সত্য করে তোলবার মতো শ্রদ্ধা রক্ষা করা এত কঠিন, তাই শৈথিল্য তার মজ্জায় প্রবেশ করেচে।

° ° ° °

আমাদের দেশে মাতৃভাষায় একদা যখন শিক্ষার আসন প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব ওঠে তখন অধিকাংশ ইংরেজি জানা বিদ্বান আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। সমস্ত দেশের সামান্য যে কয়জন লোক ইংরেজি ভাষাটাকে কোনোমতে ব্যবহার করবার সুযোগ পাচ্চে তাদের ভাগে উক্ত ভাষার অধিকার পাছে লেশ মাত্র কমতি ঘটে এই ছিল তাঁদের ভয়। হায়রে, দরিদ্রের আকাঙ্ক্ষাও দরিদ্র।

° ° ° °

তুফান উঠেচে বলেই হাল আরো শক্ত করেই ধরতে হবে। যে বিদ্যাকে এতদিন আমরা বিদেশের নিলামে

সস্তায় কেনা ভাঙা বেঞ্চিতে বসিয়ে রেখেচি, তাকে স্বদেশের চিত্ত বেদীতে সমাদরে বসাতেই হবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে যখন যথার্থ ভাবে স্বদেশের সম্পদ করে তুলতে পারব তখন সমস্ত দেশের অন্তরের এই দাবী তার কাছে সার্থক হবে—শ্রদ্ধয়া দেয়ং—দান করা চাই শ্রদ্ধার সঙ্গে। সেই শ্রদ্ধার অন্ন প্রাণের সঙ্গে মেলে, প্রাণ শক্তিকে জাগিয়ে তোলে।

* * *

আমার মহৎ সৌভাগ্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বদেশী ভাষায় দীক্ষিত করে নেবার পুণ্য অনুষ্ঠানে আমারও কিছু হাত রইল, অন্তত নামটা রয়ে গেল।

* * *

আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বঙ্গবাণী-বীণাপাণির মন্দির-দ্বারে বরণ করে নেবার ভার আমার পরে। সেই কথা মনে রেখে আমি তাঁকে অভিনন্দিত করি। এই কামনা করি যে, যখন ধূম-মলিন নিশীথ প্রদীপের নির্ব্বাপণের ক্ষণ এল তখন বঙ্গদেশের চিত্তাকাশে নব সূর্য্যোদয়ের প্রত্যূষকে যথার্থ স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেন ভৈরব রাগে ঘোষণা করে এবং বাংলার প্রতিভাকে নব নব সৃষ্টির পথ দিয়ে অক্ষয় কীর্ত্তি লোকে উত্তীর্ণ করে দেয়।[১০]

* * *

—ইংরেজী সমাবর্ত্তন-অভিভাষণের নমুনা—
—স্যার আশুতোষের ইংরেজী অভিভাষণের
—কিয়দংশ—

"Students of this University, allow not the pursuit of your studies to be disturbed by extra academic elements. Forget not that the normal task of the student, so long as he is a student is not to make politics, nor to be conspicuous in political life. You have not that prudent firmness, that ripe experience, that soundness of judgment in human affairs, which is essential in politics and will be attained by you only in the battle of life in the professions and in responsible positions, Delude not yourselves in your youthful enthusiasm that the complex machinery by which a state is governed may be usefully criticised and discussed without adequate training and laborious preparation. Remember further that if you affiliate yourselves with a party you deprive yourselves of that academic freedom which is a prerequisite to self-education and culture. Submit not, I implore you, to intellectual slavery and abandon not your most priceless possession

to test, to doubt, to see everything with your own eyes. Take this as a solemn warning that you can not with impunity and without serious risk to your mental health, allow your academic pursuits to be rudely disturbed by the shocks of political life. Devote yourselves therefore to the quiet and steady acquisition of physical, intellectual and moral habits and take to your hearts the motto :

"Self-reverence, self-knowledge, self-control,
These three alone lead life to sovereign power."

ভাইস্ চ্যান্সেলার্
স্যার্ হাসান সারওয়ার্দ্দী সাহেবের
১৯৩৩।২৫ শে মার্চ্চের বার্ষিক
সমাবর্ত্তন সভার ইংরেজী
অভিভাষণের

—কিয়দংশ—

"Convocation Day: Problems of life. The Annual Convocation is generally an occasion to express one's gratification at the results attained by the University, and the members of its teaching staff, and to offer congratulations to the new graduates but I consider, it is also a very suitable occasion to take some notice of the burning questions of the day for giving some suggestions on important problems of everyday life.

Graduates of the University, you are begin-

denominational bias and race hatred. There are no prohibitions which compel you to exclusiveness, narrowmindedness and selfishness.

• • • •

Let education produce such broad-minded and self-reliant citizens imbued with the true spirit of toleration and infused with true courage and strength of mind as would refuse to be led like dumb, driven cattle and be utilized as petty pawns. Be resolute and do not yield and succumb to the subtle temptation of earning cheap popularity and applause. "The dull senses and the heavy-lidded eyes of the public" more often applaud a misleader rather than the honest leader, but the future and time is the best judge of one's work and accomplishment. In the words of the great Lord Chancellor of England :—"In the long war between falsehood and truth, the falsehood always wins the first battle, and truth the last". Will you stand witness to the great University ideals of love and truth or will you not ?"

—ভাইস্ চ্যান্সেলার—
শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদের একটী প্রবন্ধে 'ছাত্রের কর্ত্তব্য' সম্পর্কে অভিমত—

"আমাদের জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে হইলে বহু চেষ্টা ও শ্রমের প্রয়োজন। যে কাজেই আমরা প্রবৃত্ত হই না কেন, যত বাধা-বিঘ্নই আমাদের পথ রোধ করুক্ না কেন কয়েকটি কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। আমরা মিথ্যার আশ্রয় লইব না। সাধ্যমত আমাদের নির্দ্ধারিত কার্য্য করিব—ফাঁকি দিব না। দলাদলি গড়িয়া উঠিতে দিব না। পরকে তোষামোদ করিব না, অভদ্র ব্যবহার করিব না। স্বার্থান্ধ হইব না। পরের মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে শিখিব। মানুষকে ঘৃণার চক্ষে দেখিব না বা কাহারও মতের সহিত একমত না হইলেই তাহাকে দোষারোপ করিব না। ছাত্রগণ! তোমাদেরই পরিশ্রম ও চেষ্টার উপর তোমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে এই কথা আজ যদি তোমরা প্রত্যেকেই অন্যাধিক

স্মরণ করিয়া নিজ নিজ কার্য্যে সম্পূর্ণভাবে মনঃসংযোগ কর তাহা হইলেই আবার বাঙ্গালী জাগিয়া উঠিবে, বাংলা ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রদেশরূপে পরিগণিত হইবে।"

—বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানান আন্দোলন—

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "বানান সংস্কার সমিতি" বলে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এঁরা "বাংলা বানানের নিয়ম" নামে একখানি পুস্তকও প্রকাশ করেছেন। ভূমিকা লিখেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় উপাধি-নায়ক শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ। সেই ভূমিকায় তিনি খুলে বলেছেন, এই পুস্তক প্রকাশ করবার উদ্দেশ্য। বিশ্ব-কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে পদকাদি পেয়েছেন, উপাধিও পেয়েছেন। কাযেই তিনি এখন বিশ্ববিদ্যালয়েরই লোক, তিনিও এই বানান আন্দোলনের সমর্থন করেছেন এবং এই সব নিয়ম নিজেও অনুসরণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যথারীতি স্বাক্ষরাদিও করেছেন। তিনি ছাড়া বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, শরৎচন্দ্রও এর সমর্থনসূচক স্বাক্ষরাদি যথাবিধি সম্পন্ন করেছেন। পুস্তকখানিরও দুই তিন সংস্করণ হয়ে গেছে, সুতরাং বহুল প্রচার যে হয়েছে তা'তে আর সন্দেহ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ লোককে ইহা কিনতে হয়েছে। এ ব্যাপার না জানলে চল্‌বার উপায় নেই যে।

ইতোমধ্যে যা'রা যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বই লিখেছেন তাঁ'রা সবাই এ নিয়ম অনুসরণ না করেই পারেন নি। টেক্‌স্ট্‌ বুক্‌ কমিটীর নোটিসও বেরিয়েছে এই মর্ম্মে যে,—ভবিষ্যতে যে সকল পাঠ্য-পুস্তক তাঁ'দের অনুমোদনের নিমিত্ত উপস্থাপিত হ'বে, সে গুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত বাংলা ভাষার এই সব বানান অনুসরণ করতে হ'বে। এই সব দেখে আপাততঃ মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয় বুঝি প্রাচীন ভেঙ্গে নতুন গড়ে তুলতেই সমর্থ হয়ে পড়লেন—কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কার্য্যতঃ ঠিক ঠিক তা হচ্ছে না, লেখবার সময় পাঠ্য পুস্তক লেখকগণ দায়ে পড়ে, কষ্ট করে লিখ্‌ছেন, অন্য কেউ প্রায় এর অনুসরণ করছেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলার বানানের যে সব পরিবর্ত্তন করেছেন, সে সকলে অন্ততঃ একটা সংক্ষিপ্ত জ্ঞান থাকা সকলেরই কর্ত্তব্য সেই জন্য এই স্থানে অতি সংক্ষেপে তা'র কিঞ্চিৎ আভাস প্রদানের চেষ্টা করলেম :—

রেফের পর ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্বের প্রয়োজন নেই। দ্ধ—দ+ধ—ধ—এরই দ্বিত্ব—অতএব র্ধ লিখতে হ'বে এবং র্দ্ধ এর বদলে র্ধ লিখতে হ'বে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নব প্রবর্ত্তিত এই পদ্ধতি অনুসারে ক-বর্গের যুক্তাক্ষরে ঙ্ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই—ং দিতে হ'বে। অহংকার, সংগীতের মত শশাংক, পালংক, পুংলিংগ, বাংলা, কলংক, কলিংগ, অন্তরংগ, প্রসংগ এইরূপ হ'বে। যশঃ যেমন বাংলায় যশ্, মনঃ যেমন বাংলায় মন্, তেজঃ যেমন তেজ হয়েছে—নভঃ, পয়ঃ, রজঃ তমঃ সেরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হয় নি, ছন্দঃ ও ছন্দ, তমঃ ও তম, তপঃ ও তপ, পযঃ ও পয সুলক্ষণ, অন্তঃ ও অন্ত, সরঃ ও সর ইত্যাদির মধ্যে অর্থ ভেদ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানে এ গুলির কি দশা হ'বে বলা হয় নি। এই সকল বিসর্গান্ত শব্দ যখন "অসমাসবদ্ধ" ভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন তা'দের বাংলা বিভক্তি যোগ হয়ে থাকে। বিসর্গের আর মর্যাদা থাকে না। যেমন—ব্রজের রজে লুটাই দেহ, চন্দ্রমার শোভা কিবা সুনীল নভে, আপনার দীর্ঘায়ুর জন্য আমরা প্রার্থনা করি, দিব্য জ্যোতির ছটায় দশ দিক্ আলোকিত, কিন্তু কারক বিভক্তির যোগে যখন বিসর্গের বিলোপ ঘটে, তখন কেবল কর্ত্তৃকারক ও কর্ম্মকারকের জন্য বিসর্গ রেখে লাভ কি? লাভ কিছু নেই—তবু লাভ এই যে শব্দগুলো যে বিসর্গান্ত ক্রমে এ কথা ভুলে গেলে, এ গুলির সন্ধি-সমাসে কেবল ভুলের বহরই বেড়ে চলবে। সন্ধি-সমাসে এই গুলির বিসর্গ স্বীকার করতে নতুন পদ্ধতি বিধান দিয়েছে।

আয়ুঃ, চক্ষুঃ, যশঃ, তপঃ, হবিঃ ইত্যাদির বিসর্গ যে শ্রেণীর সম্ভবতঃ ক্রমশঃ, ইতস্ততঃ, স্বতঃ, বশতঃ, আপাততঃ, বিশেষতঃ, অন্ততঃ প্রায়শঃ ইত্যাদির বিসর্গ সেই শ্রেণীর নয়। এ গুলিতে বিভক্তি যোগ হয় না। এই তস্ বা শস্ প্রত্যয়ের বিসর্গ নতুন পদ্ধতিতে লোপ করতে বলা হয়েছে। এ গুলি যশ, মন, তেজ ইত্যাদির মত অপভ্রষ্ট নয়, এ গুলি সম্পূর্ণ সংস্কৃত শব্দ, এ গুলিরও কিন্তু বিসর্গ লোপের বিধান হয়েছে। ক্রমশঃ, আপাততঃ ইত্যাদি সচরাচর প্রচলিত শব্দের বিসর্গ এ নিয়মে বাদ পড়েছে, কিন্তু নভঃ, মুখ্যতঃ, প্রধানতঃ, অনবধানবশতঃ, সাধারণতঃ ইত্যাদির কি হবে তা বলা হয় নি। এ গুলোরও ঐ নিয়মে চ'লে সংস্কৃত শব্দের অধিকার হরণ করা হবে। নমোনমো নমঃ, রজস্তমঃ, পুনঃ পুনঃ, শনৈঃ শনৈঃ, অহরহঃ, মুহুর্মুহুঃ, ইতস্ততঃ ইত্যাদির মাঝের বিসর্গের স্বাকার করে শেষের বিসর্গ স্বাকার করা হয় নি। ইতস্ততঃ করা যখন বাংলার ইডিয়াম্ রূপে ব্যবহৃত হয় তখন শেষের বিসর্গ লোপ করলে হয়ত তত দোষের হয় না কিন্তু উহা যখন 'এ দিক্ ওদিক্' অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন তো উহা সম্পূর্ণ সংস্কৃত শব্দ, তখন কেন তা'র শেষের বিসর্গ লোপ ক'রবার বিধান হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না।

হক্, দিক্, সম্রাট্, উপনিষৎ, বিদ্যুৎ, উদ্ভিদ্, শ্রীমান্, বিদ্বান্ প্রভৃতির জন্য হসন্ত বানান বিহিত হয়েছে। পরীক্ষিৎ, শাস্ত্রবিৎ,

সুকর্ম্মকৃৎ, ইন্দ্রিয়জিৎ, ইন্দ্রজিৎ, পরভৃৎ প্রভৃতির বানানের হস্ চিহ্ন সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু নেই।

দিদি ও ঝি ছাড়া অসংস্কৃতের অনুসরণে ঈকার প্রয়োগের বিধান দেওয়া হয়েছে। স্ত্রী লিঙ্গে বিকল্পের বিধান দিয়ে নতুন পদ্ধতি বাকী সমস্ত অসংস্কৃত শব্দে ইকার ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়েছে।

নতুন পদ্ধতিতে ঈ-যোগে ব্যক্তি বাচক শব্দের কোন স্থান নেই। কি ও কী'র তফাৎ অবশ্য দেখানো হয়েছে।

অ-সংস্কৃত শব্দে মূর্দ্ধণ্য যোগের কোন সার্থকতা নেই। মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে শ, ষ, স, ব্যবহৃত হবে।

সদৃশ অর্থে "মত" শব্দের বানান "মতো" এইরূপ বিকল্পে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে।

চাল—ছাদ, চা'ল—চাউল, ডাল—শাখা, ডা'ল—দাইল, পাট—তকতা কিংবা পট্ট, পা'ট—পারিপাট্য। ঘাট জলাশয়ের ঘাট, ঘা'ট—অপরাধ, বান—বন্যা, বা'ন—বাইন মাছ এইরূপ বানান ছিল উচ্চারণের তফাৎ দেখা'তে কিন্তু নতুন নিয়মে এই পার্থক্য থাকল না।

বাঙ্গালী ও বাঙালি দুই-ই চলবে, কিন্তু বাংলা, বাঙলা না বাঙ্গালা—আমরা গ-এর উচ্চারণ করে থাকি কিন্তু কেহই বাঙ্গ্‌লা লিখি না।

বিদেশী শব্দের বানানে ব বাদ গেছে। শ ষ স ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতার নির্দেশ হয়েছে।

ক্রিয়াপদে হস্ প্রয়োগ একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে।

নতুন বিধানে ইংরেজী শব্দের বাংলা বানানে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বিত হয়েছে। মোটামোটী একটা উপদেশ দেওয়া হয়েছে :—এসিডকে কেহ যেন এসিড্ না লেখে এই জন্য "অ্যা" নামক স্বর চিহ্নের প্রবর্ত্তন করা হয়েছে, ইংরেজী জেডের জন্য জ-এ একটী চিহ্ন যোগ করা হয়েছে, এফ্ ভিএর জন্য ফ ও ভ এ ঐরূপ চিহ্ন যোগ করলে Ph, bh এর পার্থক্য দেখানো যেতে পারে।

চন্দ্র বিন্দুর কোন ব্যবস্থা দেওয়া হয় নি।

এত বিধি-বিধান সত্ত্বেও গতানুগতিক লেখকগণ কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বানানের নিয়ম বড় মানছেন না, এই যা' আপ্শোষ্।

—বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন
ও
—পাঠ্য-ক্রম—

যতই দিন যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ততই নব নব পরিবর্ত্তন সাধিত হচ্ছে। পূর্ব্বে যদিও এর উন্নতিজনক বহু বিষয় বহু কর্ত্তা করে গিয়েছিলেন কিন্তু স্যার আশুতোষের আমলেই অত্যন্ত বেশী পরিবর্ত্তন হ'তে আরম্ভ হয়েছে। এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষার নাম ম্যাট্রিকুলেশন. এল্. এ. বা এফ্. এ পরীক্ষার নাম বদলিয়ে আই, এ করা হয়েছে। আই-কম্, বি-কম, এম্-কম, আই, এস্-সি, বি, এস্-সি, এম, এস্ সি প্রভৃতি হয়েছে নতুন তা' ছাড়া হয়েছে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট্ ক্লাস্। পাশের সংখ্যা বাড়া'বার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে, বহু বিষয়, বহুভাবে সংক্ষিপ্ত ও সহজ করা হয়েছে। আগেকার পরীক্ষা যত কঠিন ছিল এখন আর তা' নেই। পাঠ্যপুস্তক নানা ভাবে সহজবোধ্য করায় ও পড়াশুনার নানা রকম সুবিধা করে দেওয়ায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আগেকার মত তত কঠিন নেই। এণ্ট্রান্সের সময় আজ কাল যা'কে ক্লাস টেন্ বলা হয় তা'কেই বলা হ'ত ফার্ষ্ট ক্লাস্—তা'র পর সেকেণ্ড্ ক্লাস্, থার্ড ক্লাস্ ইত্যাদি করে পর পর নাইন্থ্ ক্লাস্ পর্য্যন্ত ছিল, দশবছর পড়লে এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত বলে নির্দ্দিষ্ট হ'ত: কোন কোন সময়ে প্রতিভাবান্

ছাত্রগণ ডাবল্ প্রমোশনও পেতেন বা নিম্ন শ্রেণী হ'তেই নিজ নিজ গুণবলে, টেস্ট্ পরীক্ষা বা স্কুলের হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট নির্ব্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটের জন্য বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট ফিস্ প্রভৃতি দিয়ে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হ'তে পারতেন। এখন ঠিক্ তেমন আর হয় না, তবে ছয় সাত বৎসর কোচিং-ক্লাসে প'ড়েও অনেকে পরীক্ষা দিচ্ছেন, প্রাইভেট্ পরীক্ষাও দেওয়া চল্‌ছে। বয়স ষোলর নীচে নয়। সময় সময় সে নিয়মও যাচ্ছে ভেঙ্গে।

নব প্রবর্ত্তিত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কম্পাল্‌সারী বা অবশ্য-পাঠ্য বিষয় হচ্ছে :—

১। একটি মেজর ভার্ণাকুলার ল্যাঙ্গোয়েজ্, সে হ'বে—বাংলা, উর্দ্দু, আসামী বা হিন্দী।

এতে দু' দু'টি প্রশ্ন-পত্র থাকবে।

তা'রপর—

২। ইংরেজী—আড়াইখানা প্রশ্ন-পত্র দ্বারা এর পরীক্ষা গৃহীত হ'বে।

৩। ভূগোল—এর হ'বে, অর্দ্ধ-প্রশ্নে পরীক্ষা।

৪। ভারত ও ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস—এতে হ'বে এক প্রশ্ন-পত্র।

(ক) এলিমেণ্টারী সায়ান্টিফিক্ নলেজ্—

(খ) এলিমেণ্টস অফ্ ফিজিক্স্ এণ্ড্ কেমিষ্ট্রী—

(গ) ৬ষ্ঠ পর্য্যায়ে যে সমুদয় ভাষার কথা বর্ণিত হয়েছে, তা'র যে কোন একটী ভাষা—

(ঘ) এলিমেণ্টারী মিকানিকস্—

(ঙ) এলিমেণ্টারী হাইজীন্—(যা'রা ম্যাথ্‌মেটিকস্‌কে তাঁদের কম্পালসারী পাঠ্য বলে গ্রহণ করেছে)

(চ) এলিমেণ্টস্ অফ্ বাইওলজী।

(ছ) এডিসনাল্ ম্যাথ্‌মেটিকস্—

(জ) বিজিনেস্ মেথড্ এণ্ড্ করেস্‌পণ্ডেন্স্—

(ঝ) কমার্সিয়াল্ জিওগ্রাফী—

(ঞ) এলিমেণ্টস্ অফ্ পাব্লিক্ এডমিনিষ্ট্রেসন ইন্ ইণ্ডিয়া

(ট) সিউইং এণ্ড্ নীডল্ ওয়ার্কস্—

(ঠ) মিউজিক্—

(ড) ড্রইং এণ্ড্ পেইণ্টিং—

প্রত্যেকেরই এক এক পেপার মাত্র—

কোন মেয়েই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ম্যাথ্‌মেটিকস্ না করলে ম্যাথ্‌মেটিকস্ অথবা ফিজিক্স্ বা কেমিষ্ট্রী নিতে পারবে না তা'দের আই, এ পরীক্ষায়।

বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অভিনব পরিবর্ত্তন ঘোষিত হয়েছে, তদনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন আই, এ,

আই, এস-সি, বি, এ, বি, এ-স্সি, এম্, এ, এম্-এস্-সি পরীক্ষা সম্বন্ধে যে সমুদয় নতুন নিয়ম ও পাঠ্য-ক্রম হয়েছে সেই সমুদয়ের সঙ্গে পূর্ববর্ত্তী নিয়মাবলী ও পাঠ্য-ক্রমের তুলনা করলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান পরিস্থিতির একটা মোটামোটা ধারণা করবেন। বাঙ্গালী ছেলে মেয়েদের পাঠ্য ক্রমই বিশেষভাবে উল্লিখিত হ'ল। বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে প্রতিবৎসর যে প্রকাণ্ড ২ খণ্ড ক্যালেণ্ডার নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়, তা'তেই বিশেষ ভাবে এ সব বিষয় থাকে। একখা'নাতে উত্তীর্ণদের নামাদি ও অন্যখানিতে থাকে নিয়ম কানুন এবং পরীক্ষা ও পরীক্ষকদের নির্দ্দেশ।

—ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা—

১। একটা ম্যাতৃর ভার্ণাকুলার ল্যাঙ্গোয়েজ্

(বাংলা, উর্দ্দু, আর্ম্মেনিয়ান্ বা হিন্দী)

পেপার—১ ফুল্ মার্কস্—১০০

প্রোজ্ টেক্সট্—৬০ নম্বর

পোয়েট্রী ,,—৪০ ,,

পেপার—২ (ক) গ্রামার্ এণ্ড্ কম্পোজিশন্—২৫ ,,

(খ) ইংরেজী হ'তে অনুবাদ—২৫ ,,

(গ) প্রবন্ধ— ৫০ ,,

২। ইংলিস—

পেপার—১ ফুল্ মার্কস্—১০০

(ক) প্রোজ্ টেক্সট্— ২৫

(খ) গ্রামার— ২৫

পেপার—২ ফুল্মার্কস্—১০০

(গ) পোয়েট্রী টেক্সট্ ৫০

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত কোন ভার্ণাকুলারকে ইংরেজীতে অনুবাদ (যেটা প্যাসেজ্ দেওয়া হ'বে তা'র ১টী করতেই হ'বে। ৪০

(ঙ) সহজ বিষয় নিয়ে চিঠি লেখা ২০

পেপার—৩ (হাফ্ পেপার)— ৫০

র‍্যাপিড্ রিডিংয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট পুস্তকগুলি হ'তে সাধারণ প্রশ্ন দেওয়া হ'বে এবং তদ্দ্বারা পরীক্ষার্থিগণের সহজ ইংরেজী লিখবার ক্ষমতার পরীক্ষা হ'বে।

তা'র পর পরীক্ষা দেওয়া হ'বে একটী ভারতীয় ভার্ণাকুলারের

[১] নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক হ'তে প্রশ্ন থাকবে, তা'তে দেওয়া হ'বে— ৬০ নম্বর।

[২] গ্রামার ও কম্পোজিশন্

অর্থাৎ

ব্যাকরণ ঘটিত প্রশ্ন এবং

রচনা-শক্তি পরীক্ষায়— ২০ „

[৩] প্রবন্ধে— ২০ „

—জিওগ্রাফী বা ভূগোল—

ভূগোলের অর্দ্ধ প্রশ্ন-পত্রে নম্বর দেওয়া হ'বে—৫০

—হিষ্টোরী বা ইতিহাস—

[ভারত ও ইংল্যাণ্ড্]

[১] ভারতের ইতিহাসে দেওয়া হ'বে— ৬০

ইংল্যাণ্ডের— ৪০

—এলিমেণ্টারী সায়াণ্টিফিক্ নলেজ্—

ফিজিক্স্ অঙ্ক ৫০

কেমিষ্ট্রী „ ৫০

—সাধারণ নিয়মাবলী—

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হ'লে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে পূর্ণ নম্বরের অন্ততঃ শতকরা ৩৬ করে রাখতে হ'বে, ভার্ণাকুলারে এবং ইংলিশে।

তা'রপর :—

অন্যান্য বিষয়ে শতকরা ৩০ এবং অবশ্য পাঠ্য বিষয়াবলীতে মোট সংখ্যার শতকরা ৩০ নম্বর। এডিসনাল্ সাবজেক্টে যদি কোন ছাত্র ৩০ নম্বরের কম পায় তা'হ'লে তা'র সেই নম্বর এগ্রিগেট্ বা মোট সংখ্যায় যোগ করা হ'বে না। যদি কোন

পরীক্ষার্থী অবশ্য-পাঠ্য বিষয়াবলীতে যথারীতি উত্তীর্ণ হয়, তা'হ'লে, তা'র এডিসনালের প্রাপ্ত ত্রিশের অধিক নম্বর এগ্রিগেটে যোগ করে তা'র বিভাগ ও তালিকায় স্থানের নাম নির্দ্দিষ্ট হ'বে।

যে সব পরীক্ষার্থী এগ্রিগেটে শতকরা ৬০ হিসাবে নম্বর প্রাপ্ত হ'বে সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হ'বে, শতকরা ৫০ পেলে তা'র স্থান হ'বে দ্বিতীয় বিভাগে এবং অপরাপর পরীক্ষার্থী নির্দ্দিষ্ট উত্তীর্ণ সংখ্যা পেলে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হ'বে।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পড়ানো হ'বে :—

—কম্পাল্‌সারী—

১। একটা প্রধান ভার্ণাকুলার ল্যাঙ্গোয়েজ্‌—
(বাংলা, উর্দ্দু, আসামী বা হিন্দী)
থাকবে ২টী প্রশ্ন-পত্র।

২। ইংরেজী ২টী প্রশ্ন-পত্র থাকবে।

৩। ভূগোল ১ প্রশ্ন-পত্র

৪। ভারত ও ইংল্যাণ্ডের
ইতিহাস ১

৫। গণিত ১

৬। একটা ক্লাসিক্যাল্

ল্যাঙ্গোয়েজ্—

[সংস্কৃত, পালি, আরবী, পারসী, গ্রীক্, ল্যাটিন্, ক্লাসিকাল্ আর্মেনিয়ান্, হিব্রু, সিরিয়াক্ অথবা ক্লাসিকাল্ টিবেটান্।

—অথবা—

একটা ভারতীয় ভার্ণাকুলার [সিণ্ডিকেট্ কর্ত্তৃক মনোনীত হওয়া চাই] পরীক্ষার্থীর অবশ্য পাঠ্য বলে গৃহীত ভার্ণাকুলার ছাড়া গৃহীত যেটা সেটা হলে চলবে না।

অথবা—

আধুনিক কোন ইউরোপীয় ভাষা—ইংরেজী নয়, যেমন ফ্রেঞ্চ্, জার্ম্মান্, ইটালীয়ান্ বা পর্ত্তুগীজ্, এক প্রশ্ন-পত্র—

প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান—এক প্রশ্ন-পত্র।

—অপ্শনাল্ সাব্জেক্টস্—

যাঁ'রা মেজর ভার্ণাকুলার নিয়েছে তা'রা ইচ্ছা করলে অপ্সনাল্ হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও নিতে পারবে :—

১। প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান

২। এলিমেণ্টস্ অফ্ ফিজিক্স্ এণ্ড্ কেমিষ্ট্রী

৩। মেনস্যুরেশন্ বা পরিমিতি এবং ক্ষেত্রমিতি বা সার্ভেয়িং

৪। এলিমেণ্টারী মিকানিক্স
৫। " হাইজীন্
৬। এলিমেণ্টস্ অফ্ বাইওলজী
৭। এডিসনাল্ ম্যাথ্মেটিকস্
৮। বিজিনেস্ মেথড্ এণ্ড্ করেসপণ্ডেন্স্
৯। কমার্শিয়াল্ জিওগ্রাফী
১০। এলিমেণ্টস্ অফ্ পাব্লিক্ এড্মিনিষ্ট্রেশন ইন্ ইণ্ডিয়া

প্রত্যেকের এক একটী প্রশ্ন-পত্র

এতদ্ভিন্ন পরীক্ষার্থী ইচ্ছা করলে একটী এডিসনাল্ থার্ড সাবজেক্টও নিলে নিতে পারে।

এখন পাঠ্য সম্পর্কে একটু বলা যাচ্ছে :—

যে সব পরীক্ষার্থীর বেঙ্গলী বা বাংলা মেজর ভার্ণাকুলার তাঁদের জন্য বিশ্ববিভালয় হ'তে নির্দ্দিষ্ট ও মুদ্রিত এবং প্রকাশিত নিম্ন লিখিত গদ্য ও পদ্যাংশ :—

—বেঙ্গলী প্রোজ্ বা বাংলা গদ্য—

১। ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর—ভোজন বিলাসী ও শয়ন বিলাসী
২। গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—নীতি শিক্ষা
৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বাংলা ভাষা
৪। অক্ষয়চন্দ্র সরকার—সেবা পরম ধর্ম্ম

৫। শিবনাথ শাস্ত্রী—বঙ্কিমচন্দ্র

৬। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—বাঘের কথা

৭। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বাল্মীকির জয়

৮। অশ্বিনীকুমার দত্ত—মাৎসর্য্য

৯। স্বামী বিবেকানন্দ—সুয়েজ, খালে।

১০। যোগীন্দ্রনাথ বসু—মাইকেল মধুসূদনের শেষ জীবন

১১। জগদীশচন্দ্র বসু—ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে

১২। বিপিনচন্দ্র পাল—স্যার্ আশুতোষ

১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—গুপ্তধন

১৪। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী—নিয়মের রাজত্ব

১৫। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর

১৬। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালার বিশিষ্টতা

১৭। প্রমথ চৌধুরী—মন্ত্র-শক্তি

১৮। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—মাষ্টার মহাশয়

১৯। কাজী এমদাদুল্ হক্—ইউরোপে মোস্লেম কীর্ত্তি

২০। মোহাম্মদ বরকত উল্যা—কবি ফের্দ্দৌসীর প্রতিভা

২১। ওয়াজেদ্ আলি—ভারতবর্ষ

২২। কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী—প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জো-দেরো

—ঐ পোয়েট্রী বা পদ্য—

১। কৃত্তিবাস ওঝা—ভ্রাতৃভক্তি

২। কাশীরাম দাস—গুরুভক্তি

৩। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী—কালকেতু

৪। ভারতচন্দ্র রায়—অন্নদার আত্মপরিচয়

৫। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা

৬। মাইকেল মধুসূদন দত্ত—সীতা ও সরমা

৭। গিরিশচন্দ্র ঘোষ—সিদ্ধার্থ ও বিম্বিসার

৮। গোবিন্দচন্দ্র দাস—ধৈর্য্য ধর

৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রতিনিধি, ভারত-রূপ

১০। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—হাসি ও অশ্রু

১১। অক্ষয়কুমার বড়াল—জীবন-স্বপ্ন

১২। চিত্তরঞ্জন দাশ—সাগর সঙ্গীত

১৩। প্রিয়ম্বদা দেবী—কাল বৈশাখী

১৪। প্রমথনাথ রায়চৌধুরী—বেলা যায়

১৫। করুণা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—মহাপ্রয়াণে আশুতোষ

১৬। যতীন্দ্রমোহন বাগচী—সিংহগড়

১৭। কুমুদরঞ্জন মল্লিক—শ্রীধর

১৮। কালিদাস রায়—কৃতদাস

১৯। কাজী নজরুল্ ইস্লাম্—দেখবো এবার জগৎকে

২০। হুমায়ুন কবীর—প্রার্থনা

বাংলা (সেকেণ্ড্ ল্যাঙ্গোয়েজ)

—প্রোজ্—গদ্য—

১। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর— শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা—
২। গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—নীতি-শিক্ষা—
৩। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বাংলা ভাষা—
৪। শিবনাথ শাস্ত্রী— বঙ্কিম চন্দ্র—
৫। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—বাঘের কথা—
৬। অশ্বিনী কুমার দত্ত— মাৎসর্য্য—
৭। বিপিনচন্দ্র পাল— স্যার আশুতোষ—
৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— কবি জীবনী—
৯। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী— নিয়মের রাজত্ব—
১০। চণ্ডী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর—
১১। শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— রামের সুমতি—
১২। খগেন্দ্র নাথ মিত্র— প্রেমের ঠাকুর—
১৩। মোহাম্মদ বরকতুল্যা— কবি ফর্দৌসীর প্রতিভা—
১৪। কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী— প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদরো—

—পোয়েট্রী—পদ্য—

১। মাইকেল মধুসূদন দত্ত— আত্মবিলাপ

২।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—	পূজারিণী, ভারত-তীর্থ
৩।	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—	হাসি ও অশ্রু
৪।	অক্ষয় কুমার বড়াল—	জীবন-সোপান
৫।	কামিনী রায়—	ধরায় দেবতা চাহি
৬।	প্রমথনাথ রায় চৌধুরী—	বেলা যায়
৭।	সৈয়দ এমদাদ আলি—	সেকেন্দ্রা
৮।	যতীন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত—	মানুষ

—সংস্কৃত গদ্য—

প্রোজ্‌ সিলেক্‌সনস্‌ —

— পঞ্চতন্ত্র —

(ক) পঞ্চতন্ত্রকথামুখম্

(খ) শ্রেষ্ঠী-নাপিত-ক্ষপণক কথা।

(গ) সিংহ-শৃগাল-শিশু কথা।

(ঘ) মণ্ডুক-কৃষ্ণসর্প কথা।

(ঙ) নীলবর্ণ শৃগাল কথা।

(চ) ধর্ম্মবুদ্ধি-পাপবুদ্ধি কথা।

(ছ) ক্ষুদ্রানাম্ সংহতি।

(জ) সোমিলকাখ্যানম্।

(ঞ) মাগাত্মান শিবেরুপাখ্যানম্

(ট) বল্মাকোদর সর্প কথা।

— হিতোপদেশ —

(ক) কঙ্কণ-লুব্ধ-পান্থ কথা—

(খ) বুদ্ধিবলম্—

(গ) বন্ধুবলম্—

(ঘ) বক-রাজহংস-কথা—

(ঙ) অসৎ সঙ্গ দোষঃ—

(চ) অপায় চিন্তা-প্রয়োজনম

(ছ) অবিবেকস্থ পরিণামঃ—

(জ) অজ্ঞাতকুলশীল বন্ধুঃ—

(ঝ) প্রিয়বাদী শত্রু—

—বিষ্ণুপুরাণ—

(ক) মান্ধাতৃ কথা—

(খ) সৌভরী উপাখ্যানম্—

— ভোজপ্রবন্ধ —

(ক) ভোজ-শকুন্তক-মরালানাম্—

(খ) ভোজ-বিপ্র-বিদ্বৎ-কুটুম্বানাম্—

— ললিতবিস্তর —

(ক) শাক্যকুমারানাম্ অস্ত্র পরীক্ষা—

—পোয়েট্রী সিলেক্সনস —

— রামায়ণ —

(ক) বানররামাদিন্ প্রত্যানেতুমাগতেন ভবতেন-সহ রামস্য সংবাদঃ।

— মহাভারত —

(ক) যতুগৃহদাহ ;

— বিষ্ণুপুরাণ —

(ক) প্রহ্লাদ চরিতম্।

—ইংলিশ প্রোজ—

[ক] সিলেক্ট রিডিংস্ ফ্রম্ ইংলিশ প্রোজ

১। ওলিভার্ গোল্ড্স্মিথ—দি সিটিজেন অফ্ দি ওয়ার্লড

২। জর্জ বোরো—দি ফ্ল্যামিং টিন্‌ম্যান্

৩। স্যার্ ওয়াল্টার্ স্কট—এড্ভেন্চারস্ অফ্ রবার্ট ক্রুস্

৪। স্যাক্সপীয়ার—দি গ্যাড্সিন এড্ভেন্চার

৫। স্টইকৃট্—এড্‌ভেন্‌চারস্ ইন্ ব্রব্‌ডিং ন্যাগ্—
৬। ডাব্লিউ কাউপার্—লেটারস পেজেস্ ৯১—৯৭।
৭। এফ, এস্, স্মাইথ—দি এভালাঞ্চি
৮। চেষ্টারফিল্ড্—লেটার্ টু হিজ্ সন্
৯। লিউয়িস্ ক্যারোল্—দি হোয়াইট্ নাইট্
[খ] টেলস্ অফ্ রাজপুত সিভালরী

—ইংলিশ্ পোয়েট্রী—

পিসেস্ ফ্রম্ লাহিড়ী সিলেক্ট্ পোয়েমস্

১। ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ—ফ্রম্ দি প্রিলিউড্
২। ম্যায়ার্—অফ্ দি গ্রাউণ্ড্
৩। ন্যাসে—ইন্ টাইম্ অফ্ পেষ্টিলেন্স্
৪। এনেন্—দি কিংস্ কামিং
৫। জন্ গে দি মাইজার্ এণ্ড প্লুটুস্
৬। উইলিয়াম্ কাউপার্—দি ডাইভারটীং হিষ্টোরী অফ্ জন্ গিলপিন্
৭। উইলিয়াম্ ব্ল্যাক্—দি একোইং গ্রীন্
৮। ডাব্লিউ ওয়ার্ডসওয়ার্থ—লুসী
৯। ওয়াল্‌টার্ স্কট্—ইণ্টোডাকসন্ টু দি লে অফ্ দি লাষ্ট্ মিনষ্ট্রেল্

৯। সাদী—দি ইঙ্কেপ্ রক্

১০। সেলী—অটাম্, এডার্জ্জ

১১। ল্যাটে—এবাইড্ উইথ্ মি

১২। টেনীসন্—হোম্ দে ব্রট্ দি ওয়ারিয়ার্ ডেড্

১৩। কীটস্—এ সঙ এবাউট্ মিসেল্ফ্ মেগ্ মেরিলিস্

১৪। কিংশ্লে—দি থ্রি ফিসারস্

১৫। আর্, ব্রাউনীং—হাউ দে ব্রট্ দি গুড্ নিউজ ফ্রম ঘেণ্ট্ টু এইক্স্

১৬। রোসেটী—ইভ

১৭। ডাব্লিউ, গিব্সন্—দি লাইট্ হাউস্

১৮। ডি, এইচ্ লরেন্স্—দি মস্কিউটো

ইণ্টারমিডিয়েট্ একজামিনেশন্ ইন্ আর্টট

এণ্ড

ইন্ সায়ান্স্

এর সংক্ষেপে নাম দেওয়া হ'য়েছে—আই, এ এবং আই-এস্-সি। এই দু'টী পরীক্ষা দিতে হ'লে পরীক্ষার্থীকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অধ্যয়ন ক'রতে হ'বে :—

১। ইংরেজী—(থ্রি পেপার্স্) অর্থাৎ ইংরেজীর জন্য হ'বে তিনখানি প্রশ্ন-পত্র।

২। যে কোন ভার্ণাকুলার ল্যাঙ্গোয়েজের একটী।

৩। নিম্নলিখিত তিনটী বিষয়ের যে কোন দু'টী :—

গ্রূপ—'এ'

(ক) সংস্কৃত (খ) পালি (গ) আরবী অথবা পারসী ইত্যাদি।

(খ) ইতিহাস

(গ) লজিক্—(ন্যায়)

(ঘ) ম্যাথমেটিক্স্—(গণিত)

(ঙ) এলিমেণ্টস্ অফ্ সিভিক্স

(চ) কমার্সিয়াল্ এরিথমেটিক্ এণ্ড এলিমেণ্টস্ অফ্ বুক-কীপিং।

গ্রূপ—'বি'

[১] ফিজিক্স্ [২] কেমিষ্ট্রী [৩] জিওগ্রাফী [৪] ফিজিওলজী [৫] জুলোজী [৬] বোটানী।

উল্লিখিত "এ" এবং "বি" গ্রুপের প্রত্যেক বিষয়ে দু'টী ক'রে প্রশ্ন-পত্র দেওয়া হ'বে।

প্রত্যেক বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে তিন্ ঘণ্টা সময় দেওয়া হ'বে এবং ১০০ ক'রে নম্বর থাক্‌বে।

ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হ'লে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে ইংরেজীতে রাখতে হ'বে—১০৮ নম্বর।

ভার্ণাকুলারে— ৩৬ ,,

এগ্রীগেটে—৩৪০

ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ ক'র্তে হ'লে রাখতে হ'বে— ৫০০

সেকেণ্ড্ ডিভিসনে পাশ কর্তে হ'লে রাখতে হ'বে—৪০০

ফিস্ দিতে হবে ৩০৲ টাকা।

পরীক্ষার আবেদনের সঙ্গে সঙ্গেই এবং পরীক্ষার্থী যদি ফেল্ হয় বা পরীক্ষা না দেয় ঐ টাকা ফেরৎ পা'বে না।

তা'রপর আই, এস্-সির কথা :—

এই পরীক্ষা দিতে হ'লে পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা দিতে হ'বে—

(১) ইংরেজী—তিন পেপারে

(২) যে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ভার্ণাকুলারের এক পেপারে।

(৩) কেমিষ্ট্রী বা রসায়নের দু' পেপারে

(৪) ম্যাথ্মেটিক্স্ অথবা ফিজিক্সের দু' পেপারে

তা'ছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে কোন একটার দু' পেপারে—

ম্যাথ্মেটিক্স্ [চতুর্থ বিষয় ব'লে যা, গৃহীত হয় নি]

ফিজিক্স—বোটানী, জুলোজী, জিওলজী, জিওগ্রাফী, ফিজিওলজী।

২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ হচ্ছে আই, এরই মত।

ইংরেজীতে পড়তে হ'বে :—

১। ক্যাল্‌কাটা ইউনিভারসিটি ইণ্টারমিডিয়েট, প্রোজ্‌ সিলেক্‌সনস্‌

২। ঐ পোয়েটিক্যাল্‌ সিলেক্‌সনস্‌

৩। সিলেক্‌সনস্‌ ফ্রম্‌ দি বাইবেল পার্ট ওয়ান

৪। এইট্‌ মডার্ণ প্লেজ্‌

৫। টেল্‌স্‌ অফ্‌ হিরোইজম্‌ এণ্ড্‌ এড্‌ভেনচার্‌

এ ছাড়া এছে বা প্রবন্ধ, প্রসোডী ও রেটরিক অর্থাৎ ছন্দ ও অলঙ্কার এবং আন্‌সান্‌ প্যাসেজ্‌ নিয়ে একখানি পেপার্‌ থাক্‌বে, তা'রও পরীক্ষা হ'বে। এর নাম থার্ড পেপার্‌।

ইংরেজীর অল্‌টারনেটিভ্‌ পেপারের বই হচ্ছে :—

দি গোল্‌ডেন্‌ বুক্‌ অফ্‌ মডার্ণ ইংলিস্‌ পোয়েট্রী

ফষ্টারের—ওয়ার্ডস্‌ য়েণ্ড্‌ এবং দি গোল্‌ডেন্‌ বুক অফ্‌ মডার্ণ ইংলিশ পোয়েট্রী।

তা'রপর বাংলা যা'দের ভার্ণাকুলার্‌ তা'দের পড়তে হ'বে ইউনিভারসিটির নির্দ্দিষ্ট :—

ইণ্টারমিডিয়েট্‌ বেঙ্গলী সিলেক্‌সনস্‌

কি ষ্ট্যাণ্ডার্ডের অর্থাৎ কতখানি জ্ঞান থাকা দরকার তা'র

আদর্শস্বরূপ নিম্নলিখিত বইগুলি অনুমোদন ক'রেছেন :—

৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের—রচনা সংগ্রহ

৺স্বামী বিবেকানন্দের—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য

৺মানকুমারী বসুর—কাব্যকুসুমাঞ্জলি

৺কামিনী রায়ের—আলো ও ছায়া

৺মীর মুসারেফ হোসেনের—বিষাদ-সিন্ধু

স্যার্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের—বিচিত্র প্রবন্ধ

কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্তের—সংস্কৃত নাটকের গল্প

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের—মন্দ্র

কমলকৃষ্ণ বসুর—কবিকঙ্কণ চণ্ডী

৺রজনীকান্ত সেনের—বাণী

৺দীনেশচন্দ্র সেনের—আশুতোষ-স্মৃতিকথা

যা'দের সেকেণ্ড্ ল্যাঙ্গোয়েজ্ বাংলা তা'দের জন্য ও মেয়েদের জন্য :—

১। যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর—মহাভারতী

২। শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের—মেজ দিদি

৩। ঈশানচন্দ্র ঘোষের—জাতক মঞ্জরী

৪। মানকুমারী বসুর—বীরকুমার বধ

৫। মাইকেল মধুসূদনের—মেঘনাদ বধ, সীতা ও সরমা

(দীননাথ সান্যালের সংস্করণ)

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের—লোকসাহিত্য

৭। শরচ্চন্দ্রের চট্টোপাধ্যায়—নিষ্কৃতি

৮। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের—কাব্য সঞ্চয়ন

৯। নবীনচন্দ্র সেনের—অমিতাভ

১০। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের—ভারত মহিলা

১১। কৃত্তিবাস—রামায়ণ [নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের সংস্করণ]

১২। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের—মহিলা।

—সংস্কৃত—

১। ইউনিভারসিটি স্যাংস্ক্রিট্ সিলেক্সনস্—প্রোজ

২। পোয়েট্রী—ভগবদ্গীতা—২।১১ অধ্যায়

৩। ভাট্টিকাব্যম্—ফার্ষ্ট ক্যাণ্টো

৪। কুমার সম্ভবম্—ফিফথ্ ক্যাণ্টো

—পার্শী—

ইণ্টারমিডিয়েট্ পারসিয়ান্ সিলেক্সনস্—

—পালি—

ইণ্টারমিডিয়েট্ পালি সিলেক্সনস্।

—হিষ্টোরী—

ফাষ্ট পেপার্—হিষ্টোরি অফ্ ইংল্যাণ্ড্—

প্রাচীনতম কাল হ'তে ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব অবধি।

সেকেণ্ড্ পেপার—হিষ্টোরি অফ্ গ্রীস্ এণ্ড্ রোম্—

গ্রীসের প্রাচীন কাল হ'তে রোমান্ কংকোয়েষ্ট্ অবধি।

রোমের প্রাচীন্ কাল হ'তে ওয়েষ্টার্ণ এম্পায়ার্ এক্সটিংসন্ অবধি।

হিষ্টোরিক্যাল্ জিওগ্রাফীর জ্ঞান্ও থাকা চাই।

—বি. এ ও বি. এস্.সি—

ম্যাট্রিকুলেশন ও আই, এ, আই, এস্-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে পাওয়া যায় এক এক খানি সার্টিফিকেট্ তা'তে কোন উপাধি দেওয়া হয় না নামের শেষে এ সব উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কোন কিছু পদবী ব্যবহার করা চলে না কিন্তু বি. এ ও বি, এস্-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে নামের শেষে এই উপাধি বসানো যায় এবং এই উপাধি দান কালে বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার্ ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি মিলিত হ'য়ে যে কন্‌ভোকেশন্ বা সমাবর্ত্তন সভা করেন সেই খানে

বি, এ, বি. এস্‌-সি ও এম্‌, এ, এম্‌, এস্‌-সি প্রভৃতি উপাধিধারীদিগকে ডিপ্লোমা পত্র দেওয়া হয়। এই সমাবর্তন-সভায় নিজে উপস্থিত না হইলেও কলেজের প্রিন্সিপাল্‌ ঐ ডিপ্লোমা কলেজে নেওয়াইয়া দিতে পারেন। বি, এ, বি, এস্‌-সি, এম্‌, এ, এম্‌, এস্‌-সি হচ্ছে ডিগ্রী।

বি, এ বা ব্যাচেলার্‌ অফ্‌ আর্টস্‌ এবং বি, এস্‌-সি, বা ব্যাচেলার্‌ অফ্‌ সায়ান্স্‌ উপাধি ছাড়া সম্প্রতি বাণিজ্য বিভাগীয় শিক্ষায় এতদ্রূপ শিক্ষিতগণ—আই-কম্‌, বি-কম্‌ প্রভৃতি উপাধিও লাভ করছেন। এতদ্ব্যতীত চিকিৎসা ও ইঞ্জিনিয়ারীং প্রভৃতিতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ এবং অধ্যয়নাদির সুব্যবস্থা হয়েছে।

যাঁ'রা বি, এ, বি, এস্‌-সি প্রভৃতি ডিগ্রী প্রাপ্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে চাইবেন্‌ তাঁ'দের বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট নিম্নলিখিত গ্রন্থাদি ও নিয়মাদির অনুবর্তন করতে হ'বে:—

১। তাঁ'দের পড়তে হ'বে ইংলিশ।

২। এই সব ভার্ণাকুলারের যে কোন একটা :—
বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া, আসামী, বার্মীজ্‌, উর্দ্দু, আধুনিক আর্মেনিয়ান্‌, নেপালী, মৈথিলী, আধুনিক টিবেটান্‌, খাসী, মারহাট্টা, গুজরাটী, তেলেগু, তামিল, ক্যানারীজ্‌, মালয়ালাম্‌, সিংহলী বা পর্তুগীজ্‌।

যে সকল পরীক্ষার্থীর ভার্ণাকুলার্‌ ইংরেজী বা ভারতীয়

এমন কোন ভাষা যা' বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত নয়, তাঁ'দের জন্য একখানা স্বতন্ত্র ইংরেজী পেপার্ হ'বে এবং পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট ইংরেজী হ'তে সেটী একটা পৃথক্ ইংরেজী প্রশ্ন-পত্র হ'বে।

এ ছাড়া নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির মধ্যে দু'টী, পরীক্ষার্থীকে গ্রহণ করতেই হ'বে, এর একটী হ'বে এ গ্রুপ্ হ'তে বেছে নিতে :—

এর যে কোন একটী ভাষা :—সংস্কৃত,পালি, আরবী, পারসী, হিব্রু, ক্লাসিকাল্ আর্ম্মেনিয়ান্, গ্রীক্, ল্যাটিন্, ফ্রেঞ্চ্, জার্ম্মান্, ইটালিয়ান্, সিরিয়াক্, বাংলা, উর্দ্দু, হিন্দী, (১) হয় হিষ্টোরী, নয় (২) পলিটিক্যাল্ ইকোনমী এবং পলিটিক্যাল্ ফিলসফি (৩) মেণ্টাল্ এণ্ড্ মরাল্ ফিলসফী, (৪) ম্যাথ্মেটিকস্ (৫) লিঙ্গুইষ্টিকস্।

—গ্রুপ্ "বি"—

১। ফিজিক্স্, ২। কেমিষ্ট্রী, ৩। ফিজিওলজি, ৪। বোটানী, ৫। জুলজী, ৬। এনথ্রোপলজী।

পরীক্ষার্থী চারটী বিষয় নিয়ে পাশ্ কোর্স গ্রহণ করতে পারেন। অথবা তিনটী বিষয় নিয়ে অনার্স কোর্স এক বিষয়ে নিতে পারে, ভার্ণাকুলারের কোন অনার্স কোর্স এখনও হয়নি।

ইংলিশ যে ভাবে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে তা' এই সিলেবাস্ দেখলেই বুঝা যা'বে :—

ফার্ষ্ট, সেকেণ্ড, ফোর্থ এবং ফিফ্‌থ পেপারের অর্দ্ধেক নম্বর দেওয়া হ'বে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকগুলি হ'তে প্রদত্ত প্রশ্ন সমূহে।

বিষয়গুলি ও পরীক্ষার নম্বর নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত হ'বে :—

ফার্ষ্ট পেপার—পোয়েট্রী এণ্ড্ ড্রামা টেক্সট্স ১০০ নম্বর ;

সেকেণ্ড্ পেপার—প্রোজ্ টেক্সট্স ১০০ নম্বর।

এই দুই পেপারে পরীক্ষার্থীদের এই পেপারগুলির বিষয়াবলী, লেখকগণের জীবনী এবং সাহিত্যিক ধারা সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন হ'বে।

থার্ড পেপারে থাকবে—এচ্ছে অর্থাৎ প্রবন্ধ, তা'তে দেওয়া হ'বে ৫০ নম্বর। তা'ছাড়া আনসীন্ প্যাসেজেস্ থাকবে তা'র এক্সপ্লেনেশনে দেওয়া হ'বে ৫০ নম্বর।

ফোর্থ পেপারে থাকবে—এডিসনাল্ পোয়েট্রী এণ্ড্ ড্রামা টেক্সটস্। তা'তে দেওয়া হ'বে ৭৫ নম্বর। তা' ছাড়া এডিসনাল্ আনসীন্ প্রোজ্ প্যাসেজের জন্য দেওয়া হ'বে—২৫ নম্বর।

ফিফ্‌থ পেপারে থাকবে—এডিসনাল্ প্রোজ্ টেক্সটস্—

তা'তে থাকবে ৭৫ নম্বর। ঐ প্রোজেরই আন্‌সীন্ প্যাসেজের জন্য দেওয়া হ'বে ২৫ নম্বর।

সিক্সথ্ পেপারে থাকবে—ইংরেজী ভাষার ফাইললজী—তা'তে দেওয়া হ'বে ৫০ নম্বর। তা'রপর জেনারেল্ হিষ্টোরী অফ্ ইংলিশ লিটারেচার্—তা'তে থাকবে ৫০ নম্বর।

পাশ্ কোর্সে পাশ্ করতে হ'লে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে রাখতে হ'বে :—

ইংরেজীতে —১০০। ভার্ণাকুলারে— ৩৩।

"এ" গ্রুপের যে কোন বিষয়ে—১০০। "বি" গ্রুপে—১০০।

থিওরেটিক্যাল্ পেপারে—৬০। প্র্যাক্টিকালে — ৪০।

অনার্স কোর্সে পাশ্ করতে হ'লে রাখতে হ'বে :—

ইংলিশে—১৮০,

"এ" গ্রুপের যে কোন একটী বিষয়ে—১৮০,

"বি" গ্রুপের যে কোন একটী বিষয়ে—১০০,

থিওরেটিক্যাল্ পেপারে—১০৮,

প্র্যাক্টিকালে—১২।

ইংলিশে অনার্স নিতে হ'লে পরীক্ষার্থীকে ইংরেজীতে রাখতে হ'বে—২৪০ নম্বর। "এ" গ্রুপের যে কোন বিষয়ে ২৪০, ঐরূপ "বি" গ্রুপের এবং তা' ছাড়া থিওরেটিক্যালে ১০০, প্র্যাক্টিকালে ৮০। তা'রপর বলা যাচ্ছে - বি, এস্‌সির কথা :—

ব্যাচেলার্ অফ্ সায়ান্স্ পরীক্ষার্থী প্রত্যেককে পড়্তে হ'বে নিম্নলিখিত বিষয়াবলার যে কোন তিনটী—

[১] ম্যাথ্মেটিকস্ (২) ফিজিক্স্ (৩) কেমিষ্ট্রী (৪) বোটানী (৫) জিওলজী (৬) জুলজী (৭) ফিজিওলজী (৮) এক্সপেরিমেণ্টাল্ সাইকলজী (৯) এনথ্রপলজী।

ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষায় যদি কোন পরীক্ষার্থী ম্যাথ্মেটিকস্ না নিয়ে থাকে তা'কে বি, এস্-সি পরীক্ষায় ম্যাথ্মেটিকস্ নিতে অনুমতি দেওয়া হ'বে না। ফিজিক্স্, কেমিষ্ট্রীরও ঐ নিয়ম।

পাশ্ কোর্সে পাশ্ করতে পরীক্ষার্থীকে রাখতে হ'বে—ম্যাথ্মেটিক্সে ১০০, অন্য সাব্জেক্টে ৬০, থিওরেটিক্যাল্ ও প্র্যাকটিক্যালে যথাক্রমে ৪০।

অনার্স নিতে হ'লে পরীক্ষার্থীকে রাখতে হ'বে :—

ম্যাথ্মেটিক্যসে—২৪০, অন্য বিষয়ে—১৬০ ও ৮০ নম্বর করে থিওরেটিক্যাল্ ও প্রাক্টিক্যালে।

—বি, এ, বি, এস্-সি পরীক্ষায়—

পাশ্ কোর্সের ইংরেজী পাঠ্য হচ্ছে :—

১। ডিকুয়েন্সীর—রিভোলট্ অফ্ দি টার্টারস্ এণ্ড দি ইংলিশ মেইল্ কোচ্—(ব্যারো হাণ্টার্)।

২। প্যালগ্রেভস্ গোল্ডেন্ ট্রেজারী—ফোর্থ বুক।

৩। ইউনিভারসিটী প্রকাশিত "এ বুক্ অফ্ এছেস্"—

৪। বি, এ বাইবেল্ সিলেক্‌সনস্, -

৫। স্যাক্স্‌পীয়ারের—এজ্ ইউ লাইক্ ইট্—(ভেরিটী সংস্করণ)—

৬। ঐ ওথেলো।

৭। ট্রেভেলিয়ানের গার্বল্ডো এণ্ড দি থাউজেণ্ড্ (লংম্যান গ্রীন্)।

৮। বার্ণার্ড সর—আর্মস্ এণ্ড্ দি ম্যান্

—অনার্স কোর্স—

পাশ্ কোর্সের বই ছাড়া—১৯৪০ সালে ১-৫, ৪১ সালে ৩-৭।

১। স্যাক্সপীয়ারের—কিং লীয়ার (ভেরেটী)

২। বার্কের স্পীচ্ অন্ কন্‌সিলিয়েসন্ উইথ্ আমেরিকা।

৩। প্যালগ্রেভের—গোল্ডেন্ ট্রেজারী অফ্ সঙ্গস্ এণ্ড্ লিরিক্স্—ফিফ্থ পার্ট—

৪। মিল্‌টনের—প্যারাডাইজ্ লষ্ট্—বুক্ সেকেণ্ড (ভেরিটী)

৫। ওয়াল্টার্ র‍্যালে—সাম অথারস্—(চার্ফ, এ্যাডিসন)
[প্রথম চার ও শেষ একটী বাদে]

৬। এম, আর্নলড্—এ্যাচেস্ ইন্ ক্রিটিসিজম্—(সেকেণ্ড সারিজ)

৭। স্যাক্স্পীয়ার—হ্যামলেট্—(৫০ পিটী)

——0——

—বাংলা—

১। রবীন্দ্রনাথ—কর্ণ-কুন্তী সংবাদ—

২। মাইকেল—মেঘনাদ বধ—২য় সর্গ, ১৯৪১ সালে ৬ষ্ঠ সর্গ—

৩। স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জী—জাতীয় সাহিত্য—

১৯৪১ সনে পড়তে হবে :—

১। ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ।

২। কৃত্তিবাস।

৪। বঙ্কিমচন্দ্র—দেবীচৌধুরাণী—

৫। সমালোচনা সাহিত্য (ইউনিভারসিটী প্রকাশিত) এর মধ্য হ'তে ১৯৪১ সনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে—সাহিত্য-সমালোচনা, প্রাচীন সাহিত্যালোচনা এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

বাংলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডের জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছে :—

১। রবীন্দ্রনাথের—জীবন স্মৃতি।

২। রামেন্দ্রসুন্দরের—জিজ্ঞাসা।

৩। শিবনাথের—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

৪। রামগতির—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

৫। রাজকৃষ্ণ মুখার্জ্জীর—নানা প্রবন্ধ।

৬। মোহিতলাল মজুমদারের—আধুনিক সাহিত্য।

৭। শরচ্চন্দ্র চাটার্জ্জীর—দত্তা।

৮। ভূদেব মুখার্জ্জীর—সামাজিক প্রবন্ধ।

৯। দীনেশচন্দ্র সেনের—আশুতোষ স্মৃতি কথা।

—অল্‌টারনেটিভ্‌ পেপার্‌ ইন্‌ বেঙ্গলী—

(যে সব পরীক্ষার্থী বাংলা ভাষাকে সেকেণ্ড ল্যাঙ্গোয়েজ্‌ রূপে গ্রহণ করেছেন তা'দের জন্য)—

—টেক্সট্‌ বুক্‌—

হিষ্টোরী অফ্‌ লিটারেচার্‌—(৪৫ নম্বর)

১। দীনেশচন্দ্রের—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—নিম্নলিখিতাংশ পড়তে হ'বে :—

৬ষ্ঠ অধ্যায়—(গৌড়ীয় যুগ) চতুর্থ পরিচ্ছেদ—পদাবলী সাহিত্য, চণ্ডীদাস ও রামী—বিদ্যাপতি, ৭ম অধ্যায়—শ্রীচৈতন্য সাহিত্য।

২। সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যে গদ্য। ৩য়—৭ম অধ্যায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র।

হিষ্টোরী অফ্ ল্যাঙ্গোয়েজ—(২৫ নম্বর)

১। দীনেশচন্দ্র—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—১ম, ২য়, ৩য় অধ্যায়।

২। বিজয়চন্দ্র মজুমদার—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১।৫।৬।৭।৮।৯।১৪

৩। সুনীতিকুমার চ্যাটার্জ্জী—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত)

৪। সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্য কথা।

৫। নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের ক্রম বিকাশ।

প্রবন্ধে থাকবে—৩০ নম্বর।

তা'রপর সংস্কৃতের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের কথা বোঝা যাবে নীচেকার এই সংক্ষিপ্ত নির্দ্দেশিকায় :—

পাশ কোর্সে সংস্কৃত টেক্স্ট দেওয়া হয়েছে

ফার্ষ্ট পেপার :—

১। মনুসংহিতা—অষ্টম অধ্যায়—[কল্লুক টীকা সহ] (১৯৪০) এবং ১১শ অধ্যায় (১৯৪১)

২। ভারবীর—কিরাতার্জ্জুনীয় ১ম ও ১১শ সর্গ।

—সেকেণ্ড পেপার—

১। শকুন্তলা

২। ভাস—স্বপ্নবাসবদত্তা—(১৯৪০)

৩। শ্রীহর্ষ—রত্নাবলী— ১৯৪১)

—থার্ড পেপার—

১। উইনটারনিৎস্—হিস্টরী অব ইণ্ডিয়ান লিটারেচার (প্রথম খণ্ড)

ইউনিভারসিটি এডিসন, [বৈদিক সাহিত্যাংশ বাদে]

২। কেথ—ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত লিটারেচার (সংস্কৃত ড্রামা অংশ ১৯৪১)

অনার্স কোর্স

পাস কোর্সের বইগুলি ছাড়া—

ফোর্থ পেপার্ •

১। ভট্টিকাব্যম—১২শ সর্গ

২। কাদম্বরী—পীটারসনের সংস্করণের ১—২৪ পৃঃ

ফিফ্থ পেপার্—

সিলেক্‌সনস্ ফ্রম দি বেদাস্—(ইউনিভারসিটি ভল্ ১)

সিক্সথ পেপার্

সিদ্ধান্ত কৌমুদী—(কারক ও সমাস)

দণ্ডী—কাব্যাদর্শ, সাহিত্য দর্পণ চতুর্থ অধ্যায়।

বাংলা যাঁদের সেকেণ্ড ল্যাঙ্গোয়েজ তাঁদের জন্য

ফার্ষ্ট পেপার—নাটক—৭৫ নম্বর

বই নির্দ্দিষ্ট হয়েছে—

১। ক্ষীরোদ প্রসাদের—নরনারায়ণ

২। গিরিশ চন্দ্রের—বুদ্ধদেব (১৯৪০)

জনা (১৯৪১)

রেটরিক্ ও গ্রামারে দেওয়া হ'বে—২৫ নম্বর

সেকেণ্ড পেপারর্

[ওল্ড পোয়েট্রী, টেক্সট্]

এতে থাকবে ৫০ নম্বর।

১। বৈষ্ণব পদাবলী (বিশ্ববিদ্যালয়) সম্পূর্ণ বই।

২। ভারতচন্দ্রের—অন্নদামঙ্গল।

৩। কবিকঙ্কণ চণ্ডী—২য় খণ্ড, শ্রীমন্তের জন্ম হ'তে (১৯৪০,) কালকেতুর উপাখ্যান (১৯৪১)

মডার্ণ পোয়েট্রী, টেক্সট্—৫০ নম্বর

১। মাইকেল—চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

২। রবীন্দ্রনাথ—সঞ্চয়িতা

২। নবীনচন্দ্র—পলাশীর যুদ্ধ

৪। হেমচন্দ্র—বৃত্র সংহার—১০ম ও ১১শ সর্গ.

—থার্ড পেপার—

প্রোজ, টেকষ্ট—ওল্ড এণ্ড মডার্ণ ৮০ নম্বর

—ওল্ড প্রোজ টেকষ্টস—

১। তারাশঙ্কর তর্করত্ন—কাদম্বরী

২। টেঁকচাঁদ ঠাকুর—আলালের ঘরের দুলাল

৩। বিদ্যাসাগর—(১৯৪১) শকুন্তলা।

—মডার্ণ—

১। বঙ্কিমচন্দ্র—কৃষ্ণকান্তের উইল।

২। রাজকৃষ্ণ—নানাপ্রবন্ধ

৩। রামেন্দ্রসুন্দর—চরিত কথা।

ইংরেজী হ'তে বাংলা অনুবাদে থাকবে—২০ নম্বর।

—পালী—

১। বি, এ পালী সিলেক্সনস (প্রোজ এণ্ড পোয়েট্রি)

২। গ্রামার এণ্ড কম্পেরেটিভ ফাইললজী।

—হিষ্টোরী বা ইতিহাস—

—পাশ কোর্স—

ফার্ষ্ট পেপার—

ইণ্ডিয়ান্ হিষ্টোরী—

সেকেণ্ড্ পেপার্—

ইউরোপীয়ান্ হিষ্টোরী ১৬৪৮—১৮২৫।

থার্ড পেপার :—

জেনারেল হিষ্টোরী ১৮১৫—১৯১৯ (বিশেষভাবে ইউরোপ)।

—অনার্স কোর্স—

পাশ্ কোর্সের বই ছাড়া

ফার্ষ্ট পেপারে—

ডড্ওয়েলের—'স্কেচ্ অফ্ দি হিষ্টোরী অফ্ ইণ্ডিয়া—ফ্রম্ ১৮৫৮—১৯১৮।

সেকেণ্ড্ পেপার্—

থার্ড পেপার্—

ফোর্থ পেপার্—

ফিফ্থ পেপার্—

সিক্স্থ্ পেপার্ থাকবে।

এইভাবে উল্লিখিত সব বিষয়ের পরীক্ষা গৃহীত হবে। তা'রপর—এম্, এ, ও এম্, এস্-সি। তা'রপর—পোস্ট্ গ্র্যাজুয়েট্ ক্লাস্। জেনারেল এই সব লাইন্ ছাড়া ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারীং

প্রভৃতিরও এইরূপ পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন, পরিবর্জ্জন হ'য়েছে। এম, এ, এম, এস্‌সির বই গুলির কোন নির্দ্দিষ্টতা নেই। সিলেবাস অনুসরণ করে পড়াশুনা করতে হ'বে। এম, এ এম, এস্‌-সি ও পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট্ ক্লাসের সব কিছু লেখার তেমন কোন দরকার নেই—যাঁ'রা সে পরিবর্তন জানতে চা'ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার্ পড়বেন।

ভারতে গবেষণার নূতন অধ্যায়—
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে
পরমাণ-বিভাজক যন্ত্রস্থাপনের
প্রস্তাব

—টাটার প্রশংসনীয় দান—

এরূপ জানা গেছে যে, স্যার দোরাবজী টাটা দানভণ্ডারের ট্রাষ্টিগণ গবেষণার নিমিত্ত একটী সাইক্লোট্রোন (পরমাণু-বিভাজক যন্ত্র নির্ম্মাণ ও স্থাপন করবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ষাট হাজার টাকা দান করতে স্বীকৃত হয়েছেন। দানের বিশেষ সর্ত্ত এই থাকবে যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও এজন্য আরও ষাট হাজার টাকা সংগ্রহ করতে হ'বে, কারণ উল্লিখিত যন্ত্রটী স্থাপন করতে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ব্যয় পড়বে।

সাইক্লোট্রোন্ অত্যন্ত শক্তিশালী যন্ত্র। এর সাহায্যে পদার্থের পরমাণুর মধ্যস্থ নিউক্লিয়াকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে বিধ্বস্ত

করা যেতে পারে। এই যন্ত্রের প্রভাবে এরূপ শক্তিশালী বস্তু কণার উদ্ভব ঘটে (শক্তির পরিমাণ দশ লক্ষ হ'তে তিন কোটী ভোল্ট পর্য্যন্ত হয়) যে এরা পদার্থের পরমাণুসমূহের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে পদার্থের বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন সমানয়ন করে। যে সমস্ত পরমাণু স্বভাবজাত পদার্থ হ'তে পাওয়া যায় না সাইক্লোট্রোন্ যন্ত্র বর্ত্তমানে সেইরূপ নূতন ধরণের পরমাণু প্রস্তুতকরণ কার্য্যেই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইতোমধ্যে ইহাদ্বারা সাধারণ সোডিয়াম্ হ'তে অতিরিক্ত ওজন বিশিষ্ট এরূপ সোডিয়াম্ পরমাণু প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে, যা'তে রেডিয়ামের ন্যায় বহুগুণ দৃষ্ট হয়। ক্যান্সার্ প্রভৃতি ব্যাধির চিকিৎসায় বহু মূল্যবান্ রেসিডিয়ামের পরিবর্ত্তে এরূপ 'সোডিয়াম্' ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্নেষ্ট লরেন্স্ এই সাইক্লোট্রোন্ যন্ত্রটী উদ্ভাবন করেন এবং এজন্য গত বৎসর তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের নোবেল্ পুরস্কার লাভ করেছেন। তিনি প্রথম যে যন্ত্রটী প্রস্তুত করেন, তা'র ওজন ছিল মাত্র এক টন। সর্ব্বশেষে তিনি যে যন্ত্রের পরিকল্পনা করেছেন, তা'র ওজন হয়েছে প্রায় ৫০০০ টন্। রকফেলার্ 'ফাণ্ড' হ'তে এই যন্ত্র নির্ম্মাণের জন্য ৪৫ লক্ষ টাকা দান করা হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে যন্ত্রটী স্থাপন করার প্রস্তাব

হয়েছে তা'র ওজন প্রায় ৭০ টন্ হ'বে এবং এর জন্য আনুমানিক ব্যয় হ'বে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। এরূপ জানা গিয়েছে যে, এই যন্ত্র পরিচালনা করবার নিমিত্ত একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিককেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে নিয়োগ করা হ'বে। উল্লিখিত বিজ্ঞানী গত তিন বৎসর যাবৎ অধ্যাপক লরেন্সের নিকট শিক্ষা লাভ করছেন এবং শীঘ্রই তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন আশা করা যাচ্ছে।

এই যন্ত্রটা স্থাপিত হ'লে ইহা দ্বারা শুধু পারমাণবিক বিজ্ঞানেই গবেষণা চলবে না ভারতের বিভিন্ন চিকিৎসা-বিজ্ঞান-কেন্দ্রের সহযোগিতায় জীব-বিদ্যার বিভিন্ন বিষয়েও গবেষণার কার্য্য পরিচালিত হ'বে।

'সাইক্লোট্রোন্' যন্ত্র বর্তমানে আমেরিকায় ৪০টা, ইংল্যাণ্ডে একটা ও জাপানে একটি মাত্র আছে। ভারতবর্ষে এই প্রথম সাইক্লোট্রোন্ যন্ত্র স্থাপনের প্রস্তাব হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই যন্ত্র রাখবার জন্য একটা পৃথক্ অট্টালিকা নির্মাণ করতে স্বীকৃত হয়েছেন। এরূপ জানা গেছে যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপক ডাঃ মেঘনাদ সাহার পরিচালনাধীনে এই যন্ত্র-সাহায্যে গবেষণা কার্য্য চলবে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ—

[বাং ১৩৪২ সাল]

এ বছর অর্থাৎ বাং ১৩৪২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী সিনেট্ হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বার্ষিক কনভোকেশন্ হয় তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার্ স্যার্ জন্ এণ্ডারসন্ সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এবার তিনি প্রথমতঃ কোন বক্তৃতা করেন নি।

এ বছর মোট ৯১ জন পদক প্রাপ্ত হয়েছেন। সর্ব্বশুদ্ধ ৪০৫২ জন গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে ১৮৪ জন উপস্থিত থেকে পদক ও উপাধি-পত্র গ্রহণ করেছেন, তন্মধ্যে ৩৩ জন ছাত্রী। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ১৯৩৫ সালের জগত্তারিণী সুবর্ণ পদক এবং শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু ১৯৩৫ সালের ভুবনমোহিনী সুবর্ণ পদক লাভ করেছেন।

উপাধি-বিতরণী সভায় ভাইস্-চ্যান্সেলার্ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন,—প্রবেশিকা পরীক্ষার নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন

করা হয়েছে; মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ও বাংলা পাঠ্য-পুস্তকের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই সম্পর্কে বাংলার বানান সমস্যা সমাধানেরও চেষ্টা চলছে।

হাই স্কুলগুলির জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন; বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদিগকে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করেছেন। সায়ান্স কলেজের কার্য আরও বিস্তৃত করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় যত্নবান্ হয়েছেন। জীবিকার্জনের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করার সম্পর্কে বিবেচনা করা হচ্ছে। চীনা ও তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

গবেষণামূলক কার্যও রীতিমত চলছে। গত বছর বিভিন্ন বিষয়ে আট জন গ্র্যাজুয়েটকে ডক্টর উপাধি দেওয়া হয়েছে। গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতগণের প্রশংসা লাভ করেছে। ৫টা পুরস্কার ও বৃত্তিও দেওয়া হয়েছে; এই সমস্ত একত্র করলে প্রায় এক লাখ টাকা হ'বে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এস্-সি শ্রেণীতে থিওরেটিকাল্ এবং প্র্যাক্‌টিকাল্ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, সম্প্রতি ছাত্রদের ফিস্ বাবদ আয় বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু খরচের শতকরা ১৭৲ টাকা মাত্র গভর্ণমেণ্ট বহন করে থাকেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও উহা

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উন্নতিমূলক কার্য্যে ব্যয় করা যায় না। এ বছর গভর্ণমেণ্ট্ তাঁদের সাহায্য হ'তে ১৫৫০০৯৲ টাকা কমিয়ে দিয়েছেন। কোনরূপ সর্ত্ত না করে গভর্ণমেণ্ট্ দরকার মত সমস্ত টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেন, আমরা এই ইচ্ছা করে থাকি।

অনেকে বলে থাকেন, অত্যধিক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করছে এবং শিক্ষার ব্যয়-বাহুল্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ই দায়ী। এই অভিযোগের মূলে কোন সত্য নেই, কেন না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা ছাড়িয়ে দিলে প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলার প্রায় ৫ কোটী এবং আসামের ৯০ লক্ষ অধিবাসীর জন্য মাত্র এই একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র সংখ্যা আনুমানিক প্রায় ৩১ হাজার; উচ্চশিক্ষার জন্য খরচ ছয় লাখ টাকা। বৃটিশ ভারতের ২৬ কোটি ৩০ লক্ষ অধিবাসীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় আছে ২৬টা; সে সকলের ছাত্র-সংখ্যা, আনুমানিক এক লক্ষ ২০ হাজার। সমগ্র ভারতে উচ্চশিক্ষার জন্য খরচ হয় ৪ কোটী টাকারও কম, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে উচ্চশিক্ষার জন্য খরচ হয় ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। তথাকার লোক সংখ্যা মাত্র ৪॥ কোটী, বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে ১৬টী. ভারতেরই সমান। কেবলমাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিকেই সরকারী সাহায্য দেওয়া হয় ২ কোটী ২২ লক্ষ টাকা। অতঃপর তিনি এই প্রসঙ্গে ইউরোপের

অন্যান্য দেশের একটা তুলনামূলক তালিকাও প্রদান করেন।

সেকেণ্ডারী শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, বাংলা দেশে সেকেণ্ডারী স্কুলে ছাত্রের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৬০ হাজার, ছাত্রী পড়ে ৫৭ হাজার, এদের মধ্যে প্রতি ১৭ জনে এক জন উচ্চশিক্ষা লাভ করে, বৃটেনের স্কুলে ৭ লক্ষ ছাত্র পড়ে এবং তন্মধ্যে প্রতি ১২ জনে এক জন উচ্চশিক্ষা লাভ করে, কানাডায় প্রতি তিন জনে এক জন, জার্ম্মাণীতে প্রতি ৯ জনে এক জন এবং ইটালী ও জাপানে ১০ জনে এক জন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে থাকে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দেখে অনেকের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছে। বর্ত্তমান বৎসরে এই বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে ২৫ হাজার পরীক্ষার্থী ম্যাট্রিক্ পরীক্ষা দিবে; কিন্তু চা'র বৎসর পূর্ব্বে একমাত্র ইংল্যাণ্ড্ এবং ওয়েলসের সেকেণ্ডারী স্কুলগুলি হ'তেই ফার্ষ্ট একজামিনে অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় ৫১ হাজার পরীক্ষার্থী উপস্থিত হয়েছিল এবং তাঁদের মধ্যে শতকরা ৭৩ জন উত্তীর্ণও হয়েছিল। পরিশেষে তিনি বলেন সকল দেশেরই নিজস্ব সমস্যা আছে; কোন দেশেই শিক্ষাপদ্ধতি পূর্ণতা লাভ করেনি, সেইজন্য কেবল বিশ্ববিদ্যালয়কেই দোষী করলে চলবে না। আমাদের এই

প্রদেশের শিক্ষা-সমস্যা অতি জটিল। এখন সকল বাদ বিসংবাদ ভুলে সর্ববিজনীন সহযোগিতায় শিক্ষার এমন একটা পদ্ধতি নির্দেশ করতে হবে, যা' দেশের সকলের, অন্ততঃ অধিকাংশ ব্যক্তির মঙ্গলকর হয়। আদর্শ ও লক্ষ্য নিয়ে দ্বন্দ্ব করলে আর চলবে না।

—আসামের বিশ্ববিদ্যালয় ও কাউন্সিল আন্দোলনসম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ—

আসামের আন্দোলনে প্রতিপন্ন হ'য়েছে যে কতিপয় সদস্য আসামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক মনে করেন।

ভারতবর্ষে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হ'য়েছে। এক সংযুক্ত প্রদেশেই পাঁচটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে, বঙ্গদেশে দুইটী আর অবশিষ্ট প্রদেশ সমূহে এক একটী। এই বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের যদি এই আদর্শ হ'ত যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞানে, কোনটী মানস-বিজ্ঞানে, কোনটী অঙ্ক শাস্ত্রে, কোনটী পদার্থ বিজ্ঞানে, কোনটী রাজনীতি শাস্ত্র প্রভৃতিতে শীর্ষস্থান অধিকার করবে, তা'হলে এদের দ্বারা প্রভূত উপকার হ'ত, প্রদেশে প্রদেশে অনেক শিল্পকলার বিস্তার হ'ত ও নানা কল কারখানা স্থাপিত হ'ত। বহু লোক কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত হ'তে পারত, ফলে বেকার সমস্যার এমন ধারা উপস্থিত হ'ত না।

বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রতি বছর হাজার যুবক যুবতীকে প্রবেশিকা, আই, এ, বি, এ, প্রভৃতি পরীক্ষার পাশের সার্টিফিকেট দেওয়া হ'চ্ছে। এই সব ছাত্রদের গুণপণা প্রায় সকলেরই একরূপ, শুধু কেরাণীগিরিরই উপযুক্ত হ'য়ে পড়ছে। এতে ক'রে স্পষ্ট প্রতীয়মান হ'চ্ছে যে, এদেশে বিদ্যাচর্চ্চা ঠিক ঠিক হ'চ্ছে না এবং সংস্কারের জন্য এর আমূল পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক। প্রাথমিক অবস্থায় বালক বালিকাদিগকে অন্যান্য বিষয়ের সহিত কিছু কিছু শিল্প ও কারিগরী শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। মধ্যম অবস্থায় আরও যে সব উচ্চতর শিল্প ও কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হ'বে তা স্থান, সময় ও পাত্র বিশেষের উপর নির্ভর ক'রে। উচ্চ অবস্থায় শিল্প ও কারিগরী প্রভৃতি আরও উচ্চতর হওয়া আবশ্যক, এই অবস্থায় ছাত্র পৌঁছলে ইহা জানা যাবে যে কোন্ কোন ছাত্র কৃষি, শিল্প, কারিগরী নিয়ে জীবন যাপন করবে। যে সব শিল্প কারিগরীতে কারখানা খোলার প্রয়োজন সে সব স্থলে কারখানাও খুলতে হ'বে।

উপরিলিখিত মতামত সমর্থন ক'রে স্যার্ এ, পি, পেট্রোও মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী সৈদাপেট শিক্ষকদের কলেজে ব'লেছেন প্রত্যেক দেশে প্রাথমিক শিক্ষাই ভিত্তিস্বরূপ এবং তা'র সহিত সেই দেশের পূর্ব্বতন সভ্যতা ও উচ্চ শিক্ষা বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। এইরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর উচ্চ শিক্ষা

স্থাপিত হ'লে উহা সম্যক্ ফলবতী হয়। আমাদের ব্যবস্থা সেরূপ নয় ব'লে উচ্চ শিক্ষা বাঞ্ছনীয়রূপ হ'চ্ছে না।

—জাপানের দৃষ্টান্ত—

সকলেই জানেন ৬৫ পঁয়ষট্টি বৎসর আগেও জাপান একটী নগণ্য দেশ ছিল আজ সেই দেশ সভ্যজগতে অতি উচ্চস্থান লাভ করেছে। জাপানের এরূপ অভ্যুত্থানে সমস্ত জগৎ চমৎকৃত হ'য়ে গেছে। গত আঠারশ' উনসত্তর (১৮৬৯) খৃষ্টাব্দ হ'তে জাপান যে শিক্ষা-নীতি অনুসরণ ক'রছে তা' হ'চ্ছে এই :—

শিক্ষা এরূপভাবে প্রসারিত হ'বে এবং প্রত্যেক গ্রামে সকল পরিবারই এরূপ শিক্ষিত হ'বে যাতে ক'রে প্রত্যেক গ্রামে সকল পরিবারই এবং প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি শিক্ষিত হয়ে উঠ্‌বে। এই অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করবার জন্য সেখানে কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটী হয় নি। জাপান যে শিক্ষা বিষয়ে এত উন্নত হ'য়েছে তা'র মূল কারণ এই যে সেখানকার প্রাথমিক শিল্পকলা শিক্ষা-পরিপূর্ণ এবং বহুবিস্তৃত। জাপানের উচ্চশিক্ষাও উক্তরূপ এবং বিশেষভাবে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ।

জাপানের শিক্ষা-প্রণালীর উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল ব্যক্তিবিশেষকে দক্ষ ও চরিত্রবান্ করা নয়; ছাত্রসাধারণকে উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা দেওয়া এবং জাতীয় জীবন উন্নত ক'রতে পারে এরূপ লোক

তৈয়ার করা। এই শিক্ষার ফলে জাপানে বহু উচ্চশিক্ষিত শাসনকর্ত্তা, সৈন্য, ব্যবসায়ী ও শিল্পী দেখা দিয়েছেন ও তাঁদের দ্বারাই জাপান এত শীগ্‌গির এত উন্নত হ'য়েছে।

স্যার্ এ, পি, পেট্রো মহোদয় যে জাপানী শিক্ষাপ্রণালীর উল্লেখ ক'রেছেন তা'র কারণ এই যে জাপানের লোক এখনও সমধিক কৃষিকার্য্যেই নিযুক্ত। সেখানকার শতকরা বাটএর উপর জনসংখ্যা কৃষিকার্য্য দ্বারাই জীবিকা অর্জ্জন করে থাকেন। জাপানে সাতকোটী সত্তর লক্ষ শ্রমজীবীর মধ্যে শতকরা ৫৮ জন এখনও কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত। এ দেশে কেন যে এরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হ'য়েছে তা'র কারণ অনুসন্ধান করা বিশেষ আবশ্যক।

ভারতবর্ষে কোন যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পা'বার উপযুক্ত আর কোন্ যুবক নয় তা' নির্দ্ধারণ করবার কোন উপায় নেই। এখানে শিক্ষা প্রায় উদ্দেশ্যশূন্য এখানকার ছেলেরা গ্রাম্য স্কুল হ'তে এসে উচ্চ ইংরেজী স্কুলে শিক্ষালাভ করে এবং যখন দেখে জীবিকা অর্জ্জনের কোন উপায় নেই তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়ে। তা'রা এবং তাঁদের অভিভাবকগণ ভবিষ্যৎ জীবনে তা'রা কি ক'রবে স্থিরই ক'রতে পারেন না। স্কুলে শিল্প-কলা, কৃষিকার্য্য প্রভৃতি শিক্ষা না দেওয়ার জন্য ছাত্রগণ বুঝতে পারে না যে তা'রা কি এ নিয়েই জীবনযাপন ক'রবে বা কলেজে গিয়েও এইসব বিষয়ে উচ্চাঙ্গের কোন শিক্ষা পা'বে

বা উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য-বিজ্ঞান ইত্যাদির গবেষণায় নিযুক্ত হ'বে। কোন্ ছাত্রের কোন্ দিকে, কোন্ বিষয়ে প্রতিভা আছে তা' আগেই নির্দ্ধারিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। তা' হ'লে অনেক ছাত্র আপনার প্রতিভা অনুযায়ী পাঠ ও শিক্ষালাভ ক'রে জীবন সংগ্রামে কৃতকার্য্য হ'তে পারে। কিন্তু এমন হয় না এ বাংলা দেশে

ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান ও অনুপ্রেরণা

—১৯৪১ সালের কনভোকেশন—

—এ বৎসর—

—মোট ৫৩৩৫ জনের উপাধি প্রাপ্তি—

২৪ শে ফাল্গুন ১৩৪৭, ৮ই মার্চ্চ ১৯৪১ শনিবার সকালে ৯২নং আপার সার্কুলার রোডে বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়ান্স কলেজ প্রাঙ্গনে, এক সুসজ্জিত মণ্ডপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু সমাবর্ত্তন-অভিভাষণ প্রদান করেন।

বাংলার গবর্ণর স্যার জন হারবার্ট, প্রাক্তন ভাইস্ চ্যান্সেলার স্যার নীলরতন সরকারকে তাঁর "মর্য্যাদা এবং বিশিষ্ট গুণাবলীর জন্য" অনারারী ডি. এস-সি উপাধি প্রদান করেন।

ভাইস্-চ্যান্সেলার স্যার্ আজিজ-উল্ হক্ স্যার্ নীলরতনকে গবর্ণরের সমক্ষে উপস্থিত করে বলেন যে, "স্যার্ নীলরতন দীর্ঘকাল অবধি বিশ্ববিদ্যালয়ের যেরূপ সেবা করেছেন তাঁর মত অপর কেহই তদ্রূপ করতে সমর্থ হন নি।"

শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ দত্তকে "কমলা স্বর্ণপদক" প্রদান করা হয় ... বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বপ্রথম ডি, এস্ সি উপাধি প্রদান করলেন, শ্রীযুক্ত রাঘবেন্দ্র রাওকে। ডাঃ চুনীলাল মুখোপাধ্যায়কে এবার এম্, ও ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে। যে সমস্ত মহিলা পদক-পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী বিভা মজুমদার অন্যতমা। তাঁকে এবার ১৯৩৭ সালের প্রাপ্য "মোয়াট্ স্বর্ণপদক" প্রদান করা হয়েছে।

এ বৎসর মোট ৫৩৩৫ জন পদক এবং উপাধি পেয়েছেন। উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের প্রায় অর্দ্ধেক সমাবর্ত্তন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৫৭ জন মহিলা।

এ বৎসরের সমাবর্ত্তন উৎসবে সনদ পেয়েছেন যাঁরা তাঁদের সংখ্যা হচ্ছে—

বি, এ—২৭৩৩; বি এস্-সি—৭১৮; বি-কম্—২৯৯; এম, এ—২৪২; এম, এস্-সি—১১১; বি, টি—২৭৬; বি, এল্—৩৫৪; এম, বি—২০২; বি, ই—৪৫; ডি, পি-এইচ্—৩২ এবং কথ্য ইংরেজীতে—১৩।

—গবর্ণরের বক্তৃতা—

বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার্ স্যার্ হারবার্ট তাঁর বক্তৃতায় বলেন :—

"আমার ধারণা এই যে, চ্যান্সেলারের দীর্ঘ বক্তৃতা করা রীতি হিসাবে শোভন নহে।" তিনি স্যার্ তেজ বাহাদুর সপ্রুর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, এবারকার "সমাবর্ত্তন উৎসবে অভিভাষণ প্রদান করে তিনি সকলকে বিশেষ সম্মানিত করেছেন। বর্ত্তমান যুগের এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতেই বর্ত্তমান যুগের গুণাবলীর কঠোর পরীক্ষা হচ্ছে। দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য এবং প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আজ যে গুরুভার চেপে বসেছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কি সেই গুরুভার কাটিয়ে উঠতে পারবেন? বর্ত্তমান চাপ সহ্য করত না পারলে, ভবিষ্যতে কি হ'বে? এখনই আমাদিগকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'বে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের অবসান হ'বেই। সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস হ'তে পারে না।

—ভাইস্ চ্যান্সেলারের অভিভাষণ—

ভাইস্ চ্যান্সেলার স্যার্ আজিজ্-উল্ হক্, গবর্ণর বাহাদুর, স্যার তেজ বাহাদুর ও অন্যান্য সুধীমণ্ডলীকে স্বাগত সম্ভাষণ জানা'য়ে তাঁ'র অভিভাষণে বলেন, "আমরা বর্ত্তমানে এক বিরাট

আন্তর্জাতিক সঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়া যাইতেছি এবং ইহাকে বিশ্বমানবের সঙ্কট বলা চলে। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না, মানব ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা ভয়াবহ ঘটনা ঘটিয়াছে কি না। ইহা অস্ত্র ও আদর্শের সঙ্ঘর্ষ। আমরা আজ এমন এক জরুরী অবস্থার সম্মুখীন যাহার তুলনা ইতিহাসে মিলে না। ভারতবর্ষ এ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষের ক্ষেত্রে পরিণত হয় নাই এবং আজ পর্য্যন্তও আমরা সংগ্রামের বেদনা বা বিমান আক্রমণের ধ্বংসলীলা হইতে অব্যাহতই রহিয়াছি। যাঁহারা সামরিক অবস্থা ভাল বোঝেন তাঁহারা আন্তরিকভাবে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছেন যে যথাসম্ভব শীঘ্র ভবিষ্যতে সম্ভাব্য জরুরী অবস্থার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত।

কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ কেবলমাত্র সামরিক সংঘর্ষ নহে, ইহা মানুষের সর্ব্ব বিষয়ে এক প্রবল অভ্যুত্থান। অপর সকলের সহিত আমরাও ভাবপ্রবণ, উচ্ছ্বাসপ্রবণ, উৎকট সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে জড়িত হইয়া পড়িয়াছি। ইহার ফলে প্রত্যেক জাতির মানসিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রেও বহু বিঘ্ন দেখা দিয়াছে। শিক্ষাকেন্দ্র ও পণ্ডিতদের গবেষণাগার পরিত্যক্ত হইতে চলিয়াছে এবং শতাব্দী সঞ্চিত বিদ্যাভাণ্ডারের উপর আকাশ হইতে নৃশংস বর্ব্বরতা অনুষ্ঠিত হইতেছে। ভবিষ্যতে আরও কি হইবে আজ কেহ সে সব কল্পনা করিতেও সাহস পায় না।

সামরিক সজ্বর্ষ প্রসঙ্গে স্যার্ আজিজ-উল্ ইউনির্ভাসিটি ট্রেইনীং কোরের সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার দিকে গবর্ণমেন্টের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, কলকাতা ও ঢাকা ছাড়া বাঙ্গালার অন্যান্য জিলাগুলিকে কেন এই সামরিক সুযোগ দেওয়া হ'বে না তিনি তাহার কোন যুক্তি খুঁজিয়া পান না। এমন সময় আসিতে পারে যে, মাতৃভূমির রক্ষার্থে ইহাদের আহ্বান আসিবে ; তখন যুবকদিগের আগ্রহ সত্বেও যদি তাঁরা এই বিষয়ে শিক্ষিত হইতে না পারে, তবে তাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে মোটেই কৃতিত্বের বিষয় হইবে না। এদেশে প্রচুর জনবল আছে এবং এদেশের লেখাপড়া জানা যুবকেরা সামরিক শিক্ষা পাইলে সামরিক কর্ম্মচারীর মর্য্যাদা লাভে উপযুক্ত হইতেও পারে। পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া স্যার আজিজ-উল্ বলেন. "পৃথিবীর সর্ব্বত্র জাতীয় উন্নতি ও দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ কেবল যে সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করে তাহা নহে ; পরন্তু ইহার চতুর্দ্দিকে নানারকম সামাজিক, অর্থনৈতিক ঘটনারও সমাবেশ হইতেছে। বর্ত্তমানকালে প্রত্যেক দেশকে স্বদেশের দ্রব্যসম্ভারের উপর নির্ভর করিতে হয় বিশেষতঃ যখন আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায় অচল হইয়া পড়ে তখন ইহার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী করিয়া দেখা দেয়। কাজেই এই সব প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দেশের

দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুতের দিকে আমাদের অবহিত হইতে হইবে। আমরা এইরূপ উন্নতির দিকে কোন দৃষ্টি দেই নাই। অথচ আমরা এখনও বাহির হইতে এমন সব দ্রব্য আমদানী করিয়া থাকি যাহা আমাদের দেশে নিঃসন্দেহে প্রস্তুত হইতে পারে। আমি অধৈর্য্য হই নাই এবং আমি জানি, কাম্যবস্তু লাভ করিতে হইলে বহু বৎসর আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে কিন্তু সেজন্য এই কাযে এখনই আমরা কেন হাত দিব না—তাহার কোন যুক্তি আমি পাই না।”

পরিশেষে স্যার্ আজিজ-উল্ গ্র্যাজুয়েট্‌দিগের প্রতি তাঁ'র শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁহাদিগকে পরমতসহিষ্ণু হ'তে উপদেশ দেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম রক্ষা করতে বলেন।

—স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর অভিভাষণ—

স্যার তেজবাহাদুর তাঁ'র অভিভাষণের অবতরণিকায় বলেন, “পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আগ্রায় পড়িবার সময় আমি নূতন সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সংস্পর্শে আসি। আমার অধ্যাপক ও শিক্ষকের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালী ছিলেন। সেকালে যুক্তপ্রদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বহুলাংশে বাঙ্গালীদের দ্বারাই প্রভাবিত হইত। যুবকেরা সামাজিক সংস্কারের প্রেরণা পাইতে রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেনকে স্মরণ করিত এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, লালমোহন ঘোষ,

আনন্দমোহন বসু, কালীচরণ ব্যানার্জ্জী তাহাদের অনুপ্রেরণা জোগাইতেন।

স্যার্ তেজ বাহাদুর অতঃপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূয়সী প্রশংসা ক'রে বলেন যে, স্যার্ রাসবিহারী ঘোষ, স্যার্ গুরুদাস ব্যানার্জ্জী, রাইট্ অনারেবল্ আমীর আলী এবং স্যার্ আশুতোষ মুখার্জ্জী প্রমুখ শ্রেষ্ঠ আইনবিদ্‌গণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত যে ৩৩ জন ভাইস্-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে স্যার্ হেন্‌রী সামনার্ মেইন্, উইলিয়াম্ মার্কবী, উইলিয়াম্ হাণ্টার্, আর্থার্ হব্ হাউস্ ও স্যার্ গুরুদাস ব্যানার্জ্জী পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই গৌরবের সামগ্রী। সর্ব্বোপরি, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন আর একজন ভাইস্-চ্যান্সেলার ছিলেন যিনি ইঁহাদের কাহারও অপেক্ষা কোন বিষয়ে ন্যূন তো ছিলেন নাই বরং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে স্যার্ আশুতোষ এবং এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অভিন্ন ছিল বলিয়াই বলা চলে। সেই মহাপুরুষের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তাঁহার সাহচর্য্যে আসিয়া আমি তাঁহার বিরাট জীবনের বিভিন্ন দিক দেখিয়া, তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা উপলব্ধি করিয়া একান্ত মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথ কেবল বাঙ্গালীরই গৌরবের বস্তু নহেন, তিনি ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসী আমাদেরও বিশেষ গৌরবের বস্তু। আমি এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আমরা অন্য কোন প্রদেশ বা ভারতের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা বাংলাদেশের কাছেই সর্ব্বাধিক ঋণী।

শিক্ষার আদর্শ যুগে যুগে বদলায় এবং এক কালে যাহা এক দেশের পক্ষে শুভ তাহা অপর দেশের পক্ষেও শুভ হইবে এমন কোন কথা নাই। কিন্তু আমি এরূপ সমালোচনার পক্ষপাতী নহি যে, বৃটিশ রাজত্বকালে, বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির ফলে আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন অবনত হইয়াছে। আমাদের অধিকাংশ ভাবুক, লেখক, কবি ও ঐতিহাসিক হয় প্রত্যক্ষভাবে এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আসিয়াছেন, না হয় কোন না কোন প্রকারে ইহার সংস্পর্শে আসিয়াছেনই। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্যার্ জগদীশ চন্দ্র, আচার্য্য স্যার্ প্রফুল্ল চন্দ্রের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্যার্ সি, ভি, রমণের খ্যাতির কৃতিত্বও আপনাদেরই প্রাপ্য। স্যার্ যদুনাথও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আপনাদেরই অন্যতম সদস্য।

মাদ্রাজ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উভয়ে মিলিয়া স্যার্ রাধাকৃষ্ণণের ন্যায় মনীষীর সৃষ্টি করিয়াছে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয় এমন অনেক সংস্কারক এবং চিন্তাশীল

দার্শনিক উৎপাদন করিয়াছে, যাঁহাদের বক্তৃতা এবং রচনা সেকালে তো বটেই, এখন পর্য্যন্তও আমাদের চিন্তা-ধারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। একজন 'ঠাকুর' আমাদিগকে যেমন কবিতা-সম্পদ দিয়াছেন, আর একজন 'ঠাকুর' চিত্রশিল্পে নূতন ধারা বহাইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। কাযেই রাজ-নৈতিক সংস্কার বা বিদ্বেষবশতঃ আমরা যেন বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি বা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে একেবারে নিরর্থক বলিয়া অবহেলা না করি। মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতীত একটী বিরাট জাতির শিক্ষা কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না, এইজন্য আমি বরাবরই মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আমাদের জাতীয় জীবন সমৃদ্ধিশালী করিবার জন্য যাহা করিয়াছে এবং করিতেছে তাহা অস্বীকার করা উচিত হইবে না।

আমি অনেক সময় ভাবিয়াছি যে, পার্থিব স্বার্থের দ্বারা ব্যাহত না হইয়াও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আমাদের জাতীয় জীবনের প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে পারে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের অধ্যাপকেরা শিল্প প্রভৃতিরও উন্নতি করিতে পারেন। এ বিষয়ে প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টেরও দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য রহিয়াছে। অধ্যাপক এবং গ্র্যাজুয়েটগণ যাহাতে এই কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সাহায্য করা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হইতে পারে এবং ইহাদের সংশ্লেষণে এক সংস্কৃতির উদ্ভব হইতে বাধ্য। আমাদের দেশে চিরকাল উত্তর ভারতই বিভিন্ন সভ্যতা, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ধর্ম্ম ও বিভিন্ন নৈতিক প্রথার সঙ্ঘর্ষ ও সমন্বয়ক্ষেত্র হইয়া আসিয়াছে। বাংলাদেশও ইহার প্রভাব এড়াইতে পারে নাই। ভারতীয় সংস্কৃতির এই সমন্বয়-প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটিতে না ঘটিতেই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা দেখা দিয়াছে এবং ইহাদের সংযোগে এমন এক সংস্কৃতির সৃষ্টি হইয়াছে যাহা সমগ্রভাবে কেবল হিন্দুর এবং কেবল মোসলমানের নহে অথবা ইংরেজেরও নহে। ইহা সকলের সংমিশ্রণ এবং একজন্য দুঃখ করিবার কিছুই নাই।

বর্ত্তমানে যে মৌলিক প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ভারতের স্বাধীনতা অর্থাৎ তাহার চাই এমন একটা মর্য্যাদা ও এমন এক শক্তি যাহার দ্বারা সে বিশ্বের সমগ্র শক্তির মধ্যে তাহার স্বীয় আসন করিয়া লইতে পারে। এই সম্পর্কে বহু মতবাদ ও মতভেদ দেখা দিয়াছে। আমার বলিতে ইচ্ছা করে যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই সব বিভিন্ন মতবাদের সংগ্রামক্ষেত্র না হইয়া, ঐ মতবাদসমূহের পরিবেষণ স্থানে পরিণত হওয়া উচিত। অধ্যাপক ও যুবকেরা দলাদলিতে যোগদান না করিয়া যদি আমাদের আলোক বিতরণ করেন, তবেই আমরা কৃতার্থ মনে করিব।

ভারতীয় কৃষ্টি, বিভিন্ন কৃষ্টির সংমিশ্রণের ফলে বর্ত্তমান্ আকার পাইয়াছে। ইহাতে দুঃখের কোন কারণ নাই। বর্ত্তমানের বাক্‌বিতণ্ডা যখন নীরব হইবে, তখন আমরা বলিব, এই কৃষ্টি আমারও নয়, তোমারও নয়—আমাদের সকলের।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে রাজনীতির আলোচনা সঙ্গত হইবে না। তথাপি আমি বলিতে চাই যে, বাজারের গণ্ডগোল হইতে দূরে অবস্থিত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও যেন ইহার ঢেউ না পৌঁছায়। বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট আমার অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন ধীর, স্থির এবং সংযতভাবে আমাদের মধ্যে জাতীয় মনোভাব প্রসারণে সহায়তা করেন।

একটা প্রশ্ন প্রায়ই শোনা যায়, বিভিন্ন শ্রেণী, সম্প্রদায় ইত্যাদি লইয়া গঠিত এই বিরাট দেশের অধিবাসীরা এক জাতি ছিল। এ সম্পর্কে ২৮ বৎসর পূর্ব্বে "আইরিশ হোম রুল বিল্" পার্লামেণ্টে উত্থাপনের সময় তদানীন্তন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ (পরে লর্ড) এস্কুইথ্ যাহা বলিয়াছিলেন, আমার মনে হয়, সে কথা স্মরণ রাখিলে আমরা ভাল করিব। তিনি বলিয়াছিলেন, "আয়র্ল্যাণ্ডের কথা বাদ দিলেও স্কটল্যাণ্ডেই কত বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের বাস; তাঁহারা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী; জীবনের সমস্যাও তাঁহাদের বিভিন্ন ধরণের, তথাপি স্কটল্যাণ্ডবাসীরা একজাতিভুক্ত নহেন, এ কথা কে বলিতে পারে?"

মিঃ উইনষ্টন্ চার্চ্চিল্, স্যার্ আর্চ্চিবল্ড্ সিংক্লেয়ার, মিঃ হার্ব্বার্ট মরিসনের মত লোক এক দলভুক্ত হইয়া সাধারণ শক্রতার পক্ষে দাঁড়াইবেন, দুই বৎসর পূর্ব্বে তাহা কি কেহ ভাবিতে পারিত? আমাদেরও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া চলা উচিত। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে।

উপসংহারে স্যার তেজবাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রদের সম্পর্কে বলেন, 'তাহারা যে বৃহত্তর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেখানকার পরীক্ষা এবং প্রতিযোগিতা তীব্রতর। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রত্যক্ষভাবে চাকরী সংগ্রহ করিয়া না দিলেও, নিয়োগকারীদের সহিত এই সকল যুবকের সংযোগ স্থাপন করিয়া সাহায্য করিতে অবশ্যই পারে।'

—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা—

—১৯৪১ সাল—

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকারে এবং অধিকসংখ্যায় শিক্ষা গ্রহণে বাঙ্গালী ছাত্রগণ যে

বাঙ্গালী ছাত্রীগণের সহিত প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছেন, এরূপ বিশ্বাস করবার সঙ্গত কারণ আছে। এই পরীক্ষায় ছাত্রগণই এতদিন সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রে আসছিলেন কিন্তু গত বৎসর একজন ছাত্রী,ছাত্রদের এই অধিকার কেড়ে নিয়েছেন।

পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা দৃষ্টেও জানা যায় ইদানীং প্রত্যেক বৎসরই ছাত্রীগণ ক্রমশঃ অধিকসংখ্যায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছেন। এবার ১০ইমার্চ্চ হ'তে প্রবেশিকা পরীক্ষা আরম্ভ হ'বে। পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা হয়েছে ৩৩০০০। কলকাতা কেন্দ্রে প্রায় ৫৭০০ ছাত্র ও ৭০০ ছাত্রী পরীক্ষা দিবেন। গত বৎসর ২০,৯০০ ছাত্র এবং ১৫০০ ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিলেন। আসাম প্রদেশেও ২৪০০ ছাত্র এবং ২৪০ জন ছাত্রী এই পরীক্ষা দেন।

গত বৎসর ১৭৯৯৫ জন হিন্দু ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন তন্মধ্যে ১৫৪৪ জন প্রথম বিভাগে, ২৮৫০ জন ২য় বিভাগে এবং ৬০৯২ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পক্ষান্তরে মাত্র ৪১৬৩ জন মোসলমান ছাত্র গত বৎসর এই পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৮৮ জন প্রথম বিভাগে, ৪৫৯ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১১৭৯ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হ'ন। গত বৎসর ২৫৫ জন খৃষ্টান পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১৯ জন প্রথম বিভাগে, ৪০ জন ২য় বিভাগে এবং ৮২ জন ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গল্পের শেষ নেই। এর সব কিছু বলা সহজও নয়। বিশ্বের বিদ্যা একত্র আহরণ করে বিতরণ করবার চেষ্টা চলছে এখানে। আশার নেই অবধি। কবে এর আশা পূর্ণ হ'বে, কে জানে? দিন দিন এর অজস্র উন্নতি হচ্ছে। কত ভাবে, কত কাষ যে বেড়ে যাচ্ছে তা'র সীমা নেই, সংখ্যা নেই। এর—এই মহাসমুদ্র তুল্য বিদ্যালয়ের তীরে বসে বসে আমি কয়েকখানা সামান্য উপল মাত্র সংগ্রহ করলেম। আশা রইল, আরও যদি পারি ভবিষ্যতে সংগ্রহ করে এতে রেখে দেব, সঞ্চয় করে। যদি কারো কোন কাযে লাগে, কে জানে। ভারতীয় এই মহাবিদ্যালয় সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে সর্ব্বশেষে মনে পড়ছে সেই কবি-কুল-তিলক দ্বিজেন্দ্র লালের কবিতাটী—যা'তে তিনি বলেছেন :—

"দিয়াছ মানবে জগজ্জননি,
দর্শন উপনিষদে দীক্ষা ;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প
কর্ম্ম-ভক্তি-ধর্ম্ম-শিক্ষা।

* * *

কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম জ্ঞানের তুমি মা জননী·
ধর্ম্ম জ্ঞানের তুমি মা ধাত্রী।"

ধন্য এ দেশ—ধন্য এ দেশের এই বিরাট, মহান্ বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়—ধন্য সেই বিশ্বেশ্বর যিনি এতদিন ধরে—চালা'য়ে আসছেন্ এই জ্ঞান-সত্র—এমন মধুময় মধুচক্র, মধু-লোলুপদের তৃষ্ণা মেটাতে।

ওঁ মধুঃ ওঁ মধুঃ ওঁ মধুঃ।

—ইতি—